KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন 202 রাসবিহারী এভিনিউ, কল-২৯
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 21/2 21/4 22/3 22/4 23/2	Year of Publication : Dec 1956 (আষাঢ় ১৩৬৪) (চৈত্র ১৩৬৫) (আষাঢ় ১৩৬৫) ((পৌষ ১৩৬৫)
	Condition : Brittle ✓ / Good ✓
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা

সম্পাদক
বুদ্ধদেব বসু

আষাঢ় ১৩৬৪
দাম এক টাকা

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

কালিদাসের মেঘদূত

এই গ্রন্থে মূল সংস্কৃত পাঠের সংলগ্ন পৃষ্ঠায় বুদ্ধদেব বসু-র পদ্য অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে, যার স্বাদ মূলের তুলনায় 'অল্পমাত্র ন্যূন'। ৬৫ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কৃত কবিতার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, ৫৫ পৃষ্ঠাব্যাপী টীকায় বহু মনোজ্ঞ তথ্য ও মন্তব্য একত্র করেছেন। এ ছাড়া সন্নিবেশিত হয়েছে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ১৮টি নিদর্শন, এবং সে-সব চিত্র বিষয়ে আলোচনা। এই গ্রন্থে পাঠক লাভ করবেন—শুধু নতুন ক'রে কালিদাসকে নয়, ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি বিষয়ে নতুন অন্তর্দৃষ্টি।

মনোরম রেক্সিনে বাঁধাই। সাড়ে-পাঁচ টাকা

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। ১৪ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

লেখকদের বিষয়ে

* 'কবিতা'য় প্রথম প্রকাশ

* **কমলেশ চক্রবর্তী** কলকাতার বাইরে থাকেন, ইতিপূর্বে অন্যান্য পত্রিকায় এঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। **জীবনানন্দ দাশ**-এর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নতুন সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন সিগনেট প্রেস। * **দেবতোষ বসু** তরুণ লেখক, কলকাতায় থাকেন। **প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ. পড়ছেন, সম্প্রতি 'এক ঋতু' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। * **প্রদ্যুম্ন মিত্র** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। **বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়** পুরুলিয়ায় শিক্ষকতা করেন, এঁর কবিতা 'কবিতা'য় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫০-এ। **বিশ্ব চন্দ্যোপাধ্যায়**-এর প্রথম উপন্যাস 'চলোর্মি সফেন' প্রকাশের অপেক্ষা করছে। **বুদ্ধদেব বসু**-র 'কালিদাসের মেঘদূত' এম. সি. সরকার থেকে প্রকাশিত হ'লো। **রমেন্দ্র-কুমার আচার্য চৌধুরী** হুগলি মহসীন কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। **শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়** ইতিপূর্বে 'নমিতা মুখোপাধ্যায়' ছদ্মনামে 'কবিতা' ও অন্যান্য পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করেছেন। **সুনীল সরকার** বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। **সন্তোষ প্রতিহার** মেদিনীপুর কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক; 'কবিতা'র নবম বর্ষে তিনি অমিয় চক্রবর্তীর 'অভিজ্ঞান-বসন্ত' ও বুদ্ধদেব বসুর 'দময়ন্তী'র সমালোচনা লিখেছিলেন।

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬৪

একবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ৯০

সনেট

বিষ্ণু দে

যেই দূরে যাও ওঠে বিচ্ছেদের অতল অপার
বঙ্গোপসাগরে ঢেউ, যেন নিত্য মাঘী পূর্ণিমার;
আমার মুহূর্ত ঘণ্টা দিন কিংবা রাতে বারবার
অতলান্ত উপমায় তোলে মৌন নীল হাহাকার;
কিংবা যদি আসে কিছু অন্যমনা বিপ্রলব্ধ বাধা
কিংবা কোনো মনান্তরে অমাবস্যা কালিন্দীতে আধা
বিশ্বব্যাপী হতাশার ত্রিকালজ্ঞ মরা অন্ধকার,
তখনই প্রশান্ত বিশ্ব বালিতে উপলে পাড়-বাঁধা
ডুবে যায়, ভেঙে যায়, ডেকে আনে অন্তিম জোয়ার।

তারপরে সূর্যোদয়, পূর্বদেশে পাণ্ডুর রক্তিমা,
তারপরে শিথিল সকালে শুভ্র তোমার মহিমা,
তারপরে শান্ত স্থির আরোগ্যে বিস্তীর্ণ তটসীমা:
বিচ্ছেদে অভ্যস্ত আমি, বাংলায় কোথা মালাবার?
প্রশ্ন শুধু কেন বারবার এই মূঢ় হিরোশিমা?

দুটি কবিতা

আমি

জীবনানন্দ দাশ

রাতের বাতাস আসে
আকাশের নক্ষত্রগুলো জলন্ত হয়ে ওঠে
যেন কাকে ভালোবেসেছিলাম—
তখন মানবসমাজের দিনগুলো ছিল মিশরনীলিমার মতো

তার তৎপর হাত জেগে রয়েছে সৃষ্টির
অনাদি অগ্নিউৎসের প্রথম অনলের কাছে আজো
সমস্ত শরীর আকাশ রাত্রি নক্ষত্র-উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তাই
আমি টের পাই সেই নগ্ন হাতের গন্ধের
সেই মহানুভব অনিঃশেষ আগুনের
রাতের বাতাসে শিখানীলাভ এই মানবহৃদয়ের
সেই অপর মানবীকে।

সমস্ত নীলিমা—সময়—প্রেম কী উদার অনলসংঘর্ষময়ী বাসনা
মহনীয় অগ্নিপরিধির অন্তহীন কারুশিল্পসংগীতে লীন,
সেই নারীর গুঞ্জরণ শুনছি আমি
আমার গানে হৃদয় বিকম্পিত হয়ে উঠছে তার,
কোথাও মৃত্যু নেই—বিরহ নেই
প্রেম সেতুর থেকে সেতুলোকে—
চলছে—জলছে স্বাথ। এল আলো
গতির গলিতশরীরী আগুনের ;

কোথাও প্রয়াণের শেষ নেই—আমি গতিবহ্নি হে তপতীলোক
হে অন্ধকার
হে বিরাট অন্তরীক্ষ অগ্নি।

রচনাকাল : ১৩৫৪
কবিকর্তৃক পরে ঈষৎ পরিবর্তিত

চিঠি এল

কত বছর পরে তোমার চিঠি পেলাম আবার :
এই সকাল-বেলার রৌদ্রে
আমার হৃদয়ে
বারুণীর কোটি-কোটি সহচরী
তিমি-র পিঠ থেকে মকরের পিঠে আছড়ে প'ড়ে
নটরাজ্ঞীদের মতো
মহান সমুদ্রের জন্ম দিল।

*

আমি মুদ্রিত চোখ নিয়ে
তোমাকে অনুভব করি,
মনে হয়, যেন সূর্যাস্তের জাফরান আলোয়
শাদা গোলাপের বাগান ছড়িয়ে রয়েছে মাইলের-পর-মাইল,
একটা সজনে গাছও নেই,
তাই বিরাট আকাশ-চিল উড়ে এসে
শূন্য বাতাসের ভিতর আঁকাবাঁকা ব্যর্থ জ্যামিতির দাগ রেখে গেল শুধু,
তারপর দূর নীড়ের দিকে উড়ে গেল
হৃদয়ের পানীয়ের দিকে।

*

এই পৃথিবীর অব্যবহারের দিকে তাকিয়ে
কেমন-একটা তুহিন ছিল হৃদয়ে :

তোমাকে দেখে ভেঙে গেল ;
সমুদ্র যখন (শীতের শেষে) আকাশকে ভালোবাসে
শত-শত স্ফীত খোঁপার প্রেমিকা নারীর জন্ম দেয় সে তার জলের ভিতরে
তাদের সমস্ত ক্ষুধা জড়ো ক'রে
আকাশের পানে গভীরভাবে নিক্ষেপ করে সে :
তোমার উত্তাল গম্বুজের উদ্দেশে
আমার অনুভূতির আলোড়ন,—
সেই সব স্ফীত খোঁপার নারী
তোমার নিস্তব্ধ নীল ভাস্কর্যকে চূর্ণ ক'রে
গুঁড়োয়-গুঁড়োয় পৃথিবীর শস্যক্ষেতে ছড়িয়ে দেবে ;
হৃদয়ের ভিতর প্রতিভার নব-নব সন্তান কলরব ক'রে উঠবে।

রচনাকাল : ১৩৪৪

তিনটি কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

ষ্ট্রাটো স্কোয়াড্রন্ : জে. বি. নম্বর ১৩২

প্লেনের চলার যন্ত্র পায়ে-চেপে, ঐ
বসেছে পাইলট উড়বে ব'লে—
রূপোলি আবর্ত গতি শূন্যতলে
রেডারের নিরঙ্কিত দূরে স্পর্শহীন,
আসন্ন মুহূর্তে লীন।
এরি মধ্যে গর্জে ওঠে এঞ্জিনের ফলা,
জ্যোতিঃজ্বলা
পক্ষবিধূনিত দৈত্য তীব্র জেট্ শব্দে, অনধীর
তুমি কি মানসে দেখ, দ্যৌ-নাবিক, মর্তবেলা স্থির
ছিন্ন ছিন্ন ছেঁড়া ক্ষণে ঘূর্ণির এপারে এরোড্রোমে
সম্পূর্ণ স্থিতির কেন্দ্র ; প্লেন ওঠে, ঐ নীচে রোম-এ
পি-এ-এ-র ম্যাপ-ঘরে এসেছিল ভীরু এলিনোরা
নরম-ভাষিণী স্ত্রী, গোলাপি বনেটে কোলে-করা
ধ'রে বেবী পুষ্পমুখ, ব্যস্ত ভিড়ে
কিছুই হয়নি কথা, ভালো থেকো, কফি-খাওয়া ভুলে
যেন প্রাত্যহিক শুধু দুদণ্ড বিদায়, বক্ষ চিরে
বাঁকা বিদ্যুতের কক্ষে যেতে নীল ঊর্ধ্বে দুলে
প্রশস্ত ফেরে কি সেই লগ্ন অনাহত।

ঝঞ্ঝাবর্ত্তে কালপক্ষ মেলে চলো যত
ধ্বনি-বাধা ভেদ ক'রে সনিক্ ওপারে মূর্ছার
গ্রহবিশ্বউল্কারাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী, অবর্ণ অপার

তারি পাশে ক্ষীণ কাচে রুমাল-ওড়ানো নিরুদ্দেশ
চোখ-মোছা স্ত্রীর ছবি সর্বাবৃত—এই দৃষ্টি শেষ—
ঝনাৎ ঝনাৎ ঝন ঝন
ঝন ঝন, ঝন ॥

দ্বীপান্তরে

ভেবেছি ওড়াব মানস বাতাসে ফিরে
তোমার সবুজ চুলে ঢেউ তুলে
মৃদু শিরি শিরি, কোরাল দ্বীপের বাসী
ওগো নারকল, সারি নারকল, একাকী সিন্ধুতীরে।
দিগন্ত ধ'রে দেখছ আয়না, এলেম যখন কূলে
তখনো স্বপ্নে চারু নীল ঢেউ মর্মরে রাশি রাশি
সেই গ্রেনাডিনে, দ্বীপ গ্রেনাডিনে, শূন্য তোমায় ঘিরে,
ওগো নারকল, একাকী সিন্ধুতীরে।
তখন সময় ছিল না কিছুই দেবার
শুধুই সময় ছিল সে দৃষ্টি নেবার
ওগো নারকল সারি গো, সিন্ধুনীরে।
কত যে আর্দ্র ছিল বুক, কথা বন্ধ হবার মতো
হাওয়াই আকাশে ছুটে-চলা অবিরত,
আলাপের তালে তবু সে সকালে
মিলেছি মাটির চ'লে-যাওয়া মন্দিরে—
ওগো নারকল, একা নারকল সারি গো সিন্ধুতীরে ॥

আরো

আবার উঠেছি যানে,
দেখব স্টেশনে পুরোনো হাওয়ায়
হলদে ট্যাক্সি সারি,

সেই নেমে নেমে মুগস্থ সিঁড়ি ভারি—
বাহিরে আবার পরিচিত হায়
ভুরু উঁচু ময়দানে
অচেনা মূর্তি মৃত জেনারেল কারো ;
চিনব ঘোড়াটা তারো ॥

হাজার হাজার বার
চিনি না ছড়িয়ে চা তৈরি করা,
জামার বোতাম না হারানো, ভরা
পকেটে কলম, কলমে রিফিল্ ; বুকে
বেপরোয়া তবু অতি সাবধানী ট্রাফিক-পেরোনো রীতি
জাগায় না বেশি প্রীতি,
চারিদিকে গাড়ি চলেছে সকৌতুকে ;
ওপাড়ার ছেলে, ডাক-নাম জানা তার ;
প্রতিদিনে এই প্রতিদিন উদ্ধার ॥

কে জানে, শেষের আরো শিখে রাখা
কী কাজে লাগবে শেষে—
আরো নম্বর টেলিফোন বইয়ে
তারিখ ঠিকানা আরো মনে থাকা,
কৌশলে বেয়ে ওঠা উঁচু মইয়ে
কোন্ উদ্দেশে ॥

কুচু ও মন্তুর জন্যে

কমলেশ চক্রবর্তী

আমার জানালার পাশে সেই ফুল
যা দেখে তোমরা একদিন
হাসির তরল ছটায় বলেছিলে : 'ভুল,
ও-নাম, ও-ফুলের নয়। গা ঘিনঘিন
করে যে ও-নাম শুনেই,
সুতরাং অমন নামের ফুল ভূ-ভারতে নেই।'

আমার জানালার পাশে এখানেও সেই ফুল !
কুচু ও মন্তু তোমরা দু'জন
এখানেও তেমনি তরল কণ্ঠে বলো : 'করো নির্মূল,
যেহেতু ও-ফুলের নাম ওর চেয়ে সুন্দর। তোমাদের কূজন
অর্থহীন ;
অথবা এই ভুল অহরহ আমরাও করি,
যা সাধ তা সাধ্যবিহীন
তবুও স্মরি
নিজেদের সবচেয়ে সচেষ্ট মুহূর্ত।

আমার জানালার পাশে সেই ফুল আজ সন্ধ্যায় ফোটে
মনে হয় তোমাদের কল্পনা হয়ত বা বিমূর্ত
তাই ও-তৃপ্তির হাসি দেখি তোমাদের ঠোঁটে।

দু একটি দুপুর

তরুণ সান্যাল

সে বলে মাদ্রাজি শাড়ি, সবুজ আংরাখা
মাকড়সার জাল নয়, তবু আমি জালের শিকার,
রক্তের গোপন গন্ধ সুতোর আড়ালে
মাতাল বিষাদে মৌন, আমি তার স্পর্শের যৌতুকে
কামনার প্রীতি দিই প্রেতভক্ষ্য প্রেমে

আমার নিস্তার নেই চৈতন্যে বা মনে
আমার বিশ্রামে আছে লোভে রক্তস্ফীতি
মুখে বা দুচোখে হেনো রক্তের আবির
অন্ধ কোরো বিকৃত হোলিতে
আচমকা হাওয়ার হাতে স্ফুলিঙ্গ-তর্পণ
সে জানে মাদ্রাজি সাড়ি
আমি জানি শাড়ির আশ্লেষ

একেকটি মধ্যাহ্ন যায় নিহিত তুফানে
সে তখন আবিষ্ট মাস্তুল
আমার রক্তের পাপে ফেনিল উল্লাস
দু'বাহুতে ঝড়ের দু'ডানা
অবশেষে ক্ষোভ কাঁপে শিরার প্রশ্রয়ে
হানো হানো নোঙর চড়ায়
—সে বলে মাদ্রাজি শাড়ি ঢেকে রাখে
শাণিত সংঘাত

আমাকে কামুক বলো, লোভী বা লম্পট
বলো, রক্তে হত্যার বেদনা
আমি জানি, যে জেনেছে আশরীর ঘুমন্ত যন্ত্রণা
তার পায়ে লুটোয় সময়
আমার হাতের নিচে আঙুলে পল্লব
পরিপূর্ণ বেদনার ঘটে

সে বলে মাদ্রাজি সাড়ি রেশমে কার্পাশে
আমি জানি সে-আঙ্গিকে শিল্প-শিল্পী অনন্য প্রতীক
তৃষ্ণাবেদী হোমের জানুতে ॥

সম্ভ্রান্ত চাবুক

অর্চন দাশগুপ্ত

অকস্মাৎ ঘুম ভাঙে, কিছু যেন ঘটেছে কোথাও :
দূরের দিগন্ত থেকে ভেসে এলো বাঘের চীৎকার—
আশঙ্কায় আঁধারের হৃৎপিণ্ড কাঁপে থরোথরো।

বর্বর স্নায়ুতে শুনি শ্বাস ফেলে ঝড়ের জঙ্গল,
আরণ্য সংকেতে নামে উত্তেজিত আদিম জাতিরা,
চোখ জ্বলে, চতুর্দিকে অগণিত হিংস্র চোখ জ্বলে।

(রক্তের আঘ্রাণে আসে বাঘিনীরা অলক্ষ্যে তোমার,
উদ্ধত শিরায় ঋজু শরীরের তীক্ষ্ণ হাতিয়ার—
নির্ভুল নিক্ষেপে ওই বাঘিনীর অস্ত্রে ফুঁড়ে দাও।)

শহরতলির মাঠে সার্কাসের ঘুমন্ত তাঁবুতে
লোহার গরাদে শুধু বাঘের দু' চোখে ঘুম নেই,
বংশানুক্রমিক স্মৃতি ভ'রে যায় অরণ্যের স্বাদে।

ভদ্রতার পিঠে তবু সামাজিক আর-এক বাঘের
ডোরা-কাটা দাগ জ্বলে প্রত্যহের সম্ভ্রান্ত চাবুকে ॥

একলা হৃদয়ের একলা ঘরে তুমি

রাজলক্ষ্মী দেবী

একলা হৃদয়ের একলা ঘরে তুমি
কখন ফেলে গেছো তোমার ভালোবাসা।
অলস ভাঁজ-ভাঙা সুখের মৃদু ভাষা
কেন যে রেখে গেছো আমারি তরে তুমি !

কেন যে ফেলে গেছো পেছনে এই আশা !
শতেক অগোছালো চাওয়া-পাওয়ার ভিড়ে
কেন যে রেখে গেছো তোমার মায়াটিরে,
কেন যে ফেলে গেছো পুরোনো ভালোবাসা !

কেন যে এলোমেলো করেছো এই ঘর,
—কেন যে নেড়ে গেছো অলস ভীরু হাওয়া,
স্তব্ধ ঘরে কেন করেছো আসা-যাওয়া,
আমার একা সুখ বলে না সে-খবর।

বলে না সে-খবর এলানো চুপচাপ
তোমার দেহতাপে তপ্ত ভালোবাসা,
—তবু তো ভাঁজ-ভাঙা সুখের মূক ভাষা
ছড়ায় ঘরে সেই পুরোনো উত্তাপ !

অরণ্য-রাত্রি

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আনকোরা সিল্কের গুজনির মতো
অন্ধকার ঢেকে রাখলো রূপসী তার শরীরের
বাঁকানো রেখাগুলি, কিন্তু, তখনো, হায়, অসহায়
চোখের সামনে লাল, নীল, সবুজ
নগ্ন শরীরে কতো রঙের চরকিবাজি চলতে থাকলো !

চাইনে, চাইনে আবার মনে করতে অতীত, তাই
এই মৃত মুহূর্তে, এখন, এই শীতল তমসায়
সুন্দরী, ঘনকুটিল, মসৃণ সাপিনীর মতো
যুগল বাহুতে জড়াই নিজেকে, এবং হিমজমানো তার
সোনালি স্তনের নিষ্করুণ স্পর্শে
শিউরে উঠলো শরীর প্রবল জ্বরে, আর
পাহাড়ের কোন নদীতে যেন ঝড় উঠলো হঠাৎ, সশব্দে
আচমকা চুরমার হয়ে ভেঙে গেলো জীর্ণ সাঁকো, দূরে,
অরণ্যে, নেকড়ের চোখে আগুনের লকলক লোভ
দুই ঠাণ্ডা, কাচের মতো সপ্রাণ মণিকে ঘিরে জ্বলছে, এই
মৃত মুহূর্তে, এখন, এই শীতল তমসায়।

সূর্যনগরীর ইন্‌কাদের রঙিন মেয়ের চন্দ্রমল্লী চুলের গন্ধ
তারপরে ছড়িয়ে গেলো আমার নিমগ্ন সর্বাঙ্গে,
গলনালীতে জ্বালা-ধরানো মদিরার মতো
শরীরে সেই ঘ্রাণের ঝাঁজ লাগলো, আর নরম, পুরু, বিশাল
দুই উরুর মধ্যখানে উথালপাথাল হয়ে গেলো

চেতনা, যেন অদৃশ্য এক বোলতার একটানা অসহ্য,
পাগল-করানো শব্দের সমুদ্রের জোয়ারের ভিতরে
ডুবে গেলো ইহকাল—

অথচ, অন্য আলিঙ্গনে তখনো তাকে ভুলতে পারি বই ?

মানুষ-মাটি-ঘাস

(Pantoum)

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ-তলে হাওয়ার হাটে ঘাসের মাঠে শুয়ে
হঠাৎ মনে ঘা দিলো এক বেদনা-ভরা বাণী
বললো ছোটো ঘাসের শীষ গালের কাছে নুয়ে—
সখা হে, শোনো, তোমাকে বড়ো আপন ব'লে মানি।

হঠাৎ মনে ঘা দিলো এই বেদনা-ভরা বাণী—
আবার ফিরে মিলবে এসো খোলা আকাশ-তলে ;
'সখা হে, শোনো, তোমাকে বড়ো আপন ব'লে মানি,'
কানের কাছে বাড়িয়ে মুখ তৃণাঙ্কুর বলে।

'আবার ফিরে মিলবে এসো খোলা আকাশ-তলে
ঘাসেরই মতো ছিলে তো কেউ, আবার হবে ঘাস।'
কানের কাছে বাড়িয়ে মুখ তৃণাঙ্কুর বলে—
'চাও, না চাও, ভুলবে সব ছাড়ার হা-হুতাশ।

'ঘাসেরই মতো ছিলে তো কেউ, আবার হবে ঘাস।
চরমে ঘাস সবাই হয় তুমিও হবে সখা ;
চাও, না চাও, ভুলবে সব-ছাড়ার হা-হুতাশ—
প্রাণের পিছে চির-প্রাণের নিয়তি রয় ছকা।

'চরমে ঘাস সবাই হয়, তুমিও হবে সখা,
ঘাসেরই মতো শ্যামল কেউ হানলে হাতছানি ;
প্রাণের পিছে চির-প্রাণের নিয়তি রয় ছকা—
মানুষ যাকে মৃত্যু বলে আমরা তাকে জানি।

'ঘাসেরই মতো শ্যামল কেউ হানলে হাতছানি
গোপন পায়ে মৌন তুমি আসবে নেমে ঘাসে ;
মানুষ যাকে মৃত্যু বলে আমরা তাকে জানি—
সমস্যার অঙ্ক শেষ একটি নিশ্বাসে !

'গোপন পায়ে মৌন তুমি আসবে নেমে ঘাসে
সমাধি হ'য়ে কবর হ'য়ে নরম মাটি মেখে—
সমস্যার অঙ্ক শেষ একটি নিশ্বাসে !
ক্লান্তি ফেলে জিরোবে তুমি আকাশে চোখ রেখে,

'সমাধি হ'য়ে, কবর হ'য়ে নরম মাটি মেখে।'
বলবে ছোটো ঘাসের শীষ গালের কাছে নুয়ে—
'ক্লান্তি ফেলে জিরোও তুমি আকাশে চোখ রেখে
আকাশ-তলে হাওয়ার হাটে ঘাসের মাঠে শুয়ে।'

তিন মুহূর্ত

লোকনাথ ভট্টাচার্য

তারা আসেনি এক সঙ্গে, যায়নি এক সঙ্গে—তাদের মেলানো গেল না, বলা গেল না ভাই-বোন ; শুধু অনিচ্ছায় সারা সকাল কাটালুম তিক্ততায়।

কখন দেখলুম, এক নদীরই জল। এনেছি তাই বিন্দু-বিন্দু ক'রে।

এক : লগ্ন

সন্ধ্যার মতো সুন্দর এক অন্ধকার জেগেছিল তার মনে—সদ্যোজাত বেদনার মৃত্যুকে ভয় করে না জেনে সে পাড়ি দিল আমার দরজায়। অস্পষ্ট আলোকে আমি শুধু দেখেছিলুম তার চোখ কম্পিত।

তার বেশি আর কিছুই নয়। আর সেই হাওয়া, সেই আলো যা আলো নয়, আর সেই কী-যেন-বলতে-এসেছিলুম-যা-বলতে-পারলুম-না ভাব নিয়ে হঠাৎ-জেগে-ওঠা আমার বাগানের কাঁঠালিচাঁপা নিথর।

সে আমার দ্বারে এল আমারও এক নবজন্মের মুহূর্তে—সন্ধ্যার কোলে দিনের স্নিগ্ধ ঢ'লে পড়ার মতো আমি মরলুম অস্ফুট মরণে, অপার সুধা-সরোবরের তীরে সবুজ রাত্রে পাব ব'লে অচেনা ধরণীকে।

সে এল আমার দরজায় মরিয়া হ'য়ে, তাকে হারানোর ভয় পেয়ে যা তাকে কামড়ে ধরেছে কাঁকড়াবিছের মতো। সেই ভয়ের কোনো নাম আমি দেখলুম না, তাকে ডাকলুম না আসন পেতে ঘরের কোণে ;

—শুধু আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলুম যে-আলোয় ভালো ক'রে কেউ পায়নি কাউকে দেখতে, এক অসহ মুহূর্তের অবসান না-চেয়ে।

দুই : লাফ

সর্বাঙ্গে আমার ধুলো—চোখেও পাইনে ভালো ক'রে দেখতে। এমন সময় খুলে গেল ভেতরের চোখটা। একটি মুহূর্তে খুলে গেল পাষাণদুর্গের প্রকাণ্ড ফটক। আর সে কী আলো, আর সে কী রং, আর সে কী বেদনা !

বাহির বলছে তাগিদ তোমার থামাও—চোখে আমার ধুলো। ভিতর নাচে ধেইধেই ক'রে, বলে বেলা ব'য়ে যায়, আমাকে ধরো তো ধরো, নয়তো পালাব পিছন পথে ধুলো উড়িয়ে—সে-ধুলোয় তোমার ভিতরটা অন্ধকার হ'য়ে যাবে।

আমি স্বার্থপর সেই বাঘের চেয়েও, যার হাতের নাগালের মধ্যে পড়েছে এসে তন্বী হরিণী, পা তার আটকে গেছে পঙ্কিল জলায়। তাই লাফ মারলুম তড়াক ক'রে, ধরলুম মুহূর্ত—হোক না ধুলো সর্বাঙ্গে আমার, নাই বা পেলুম দেখতে চোখে।

আর, কী ক'রে বলি তোমায়—সেই কচি মুহূর্ত, তার ঐ আলো, ঐ রং, ঐ বেদনা, তাকে আমি আত্মসাৎ করলুম। আমি তাকে রসিয়ে-রসিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে খেলুম।

তিন : ভোর

অবশেষে ভোর, এবং এই ভোর সকালে উঠেই আমি তার টুঁটি টিপে ধরতে চাই, তাকে শেষ ক'রে দিতে চাই—আমার কর্তব্য, আমার আবেগ, রক্তজবা হ'য়ে ফুটেছে যে আমার ভিতরে ঐ তরুণ অরুণের মতো।

অরুণ তার লাল ধীরে-ধীরে খসিয়ে ফেলবে, ছুটবে আকাশের এক প্রান্ত হ'তে আরেক প্রান্তে, ধীরে-ধীরে ছোটো হ'য়ে প্রচণ্ডতর হবে। আমার রক্তজবার নিয়তিও কি হবে সেই সূর্যের অনুগামী, দীক্ষা নেবে পুরো বারো ঘণ্টা ধ'রে জলার, জলানোর? অথবা সে ধরা পড়বে তার ধরা-পড়ার মুহূর্তের সঙ্গে এই পাতায়, শেষে হবে নিছক কাগজের ফুল?

আমি তাকে ছেড়ে দিলুম তার নিয়তিরই হাতে।

ঐ শোনো জীবন জাগছে পাখির ডাকে, আলোয়, হাওয়ায়—এসেছে কেউ তোমার দ্বারে রাত্রির তিমির পেরিয়ে। বার্তা তার রঙিন বেদনার বাক্সে মোড়া। ছুঁয়েছ কি সে তোমার মনে তুলেছে ঢেউ, বুনেছে হাওয়া, ছুঁড়েছে

আলোর বর্শা—জাগছ তুমি ঐ পাখির সঙ্গে এক হ'য়ে, হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হ'য়ে। তোমারও খানিকটা নিল ঐ হাওয়া ঐ পাখি, ঐ আলো, সকলে এক হ'য়ে ছুটতে লাগল, প্রথমে ধীরে-ধীরে, পরে ক্রমশ জোরে—বহু যোজন পরিক্রমায় যেন একদল দৌড়ে প্রতিযোগী।

আমি কিন্তু তা না-ক'রে হঠাৎ ব'সে পড়লুম, ধরলুম কলম তুলে, ধ'রে রাখব ব'লে টিপে ধরলুম এই মুহূর্তের গলা। কিন্তু রক্ত তার ফিনকে উঠল আমার আঙুলের ফাঁকের মধ্য দিয়ে—সেই রক্তে ভরা অমর আলোর লক্ষ-লক্ষ বীজ।

ভয় পেয়ে ফেলে দিলুম মুহূর্ত, সমস্ত আঙুল আমার জ'লে গেল।

—এখন সারাদিন ছুটব উন্মত্ত ভিখারী, সুধার সরোবর চেয়ে।

প্রশ্ন

বিশ্বনাথ সমাজদার

বসন্তের এক মদির মুহূর্তে
নারী ও পুরুষের মিলন হ'লো—
বোধের অব্যক্ত পুলকে উভয়ের দেহযন্ত্র
ক্ষণিকের জন্য এক তরঙ্গের শীর্ষদেশে উঠে
দ্রুত নেমে এল খাদে।

তারপর পুরুষ আপিস যায়,
বাড়িতে এসে খায়, ঘুমোয়,
নারীর বমি পায় খেতে বসলে,
ডাক্তার বললেন গর্ভ-লক্ষণ।

প্রতিদিন স্ফীতায়িত গর্ভভারে
শয়নে চলনে তার অস্বস্তি—
পুরুষ রোজ আপিশ করে!
নারী বললো—এমন ক'রে বদ্ধ ঘরে আমি থাকতে পারব না,
আমাকেও দাও বাতাস, দাও আকাশ,
পৃথিবীকে দেখবার পথে এই যবনিকা
কেন পঙ্গু করবে আমাকে!
নিরুত্তর পুরুষ তখন আপিশ করে।

তারপর একদিন গভীর রাতে
নারী পুরুষের কণ্ঠ ধরলো চেপে—
কেন, কেন,

এই অসহ্য যাতনা আমি কেন বইব?
তোমার খুশি আমার খুশি
কেন চলবে এমন বিষম পথে?
পুরুষ নিরুত্তরে পাশ ফিরে শুলো
অন্ধকারে ফুঁপিয়ে উঠলো নারী।

তারপর দিনের আলোয় নারী ভাবলে
নিজের মধ্যে একটি জীবনকে গ'ড়ে তুলছি প্রতি মুহূর্তে,
এই তো আমার চরম গর্ব;
এমন সৃষ্টি পুরুষ তো পারে না—
তুচ্ছ ওরা।—
পুরুষ তখন আপিশ করছে।

তারপর একদিন নারীর সৃষ্টি
তার দেহের শিরায়-শিরায়
তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত হেনে
আলোয় আসার বাসনা জানালো—
গর্বিতা নারী প্রথমে ঠোঁট চেপে কান্না রোধ করলো,
তারপর জানালো সবিলাপ মৃত্যুর আশঙ্কা,
অবশেষে ছেদনের আগে কসাই যেমন পশুর সন্ধান করে,
নারী তেমনি সন্ধান করলো পুরুষের—
পেল না—পুরুষ তখন আপিশে,
পেল এক কোমল দন্তহীন মুখের স্পর্শ।

তারপর দুজনা হ'য়ে ফিরে এল নারী
হাসপাতাল থেকে।
ক্ষীরভারে বুক তার টনটন করছে—
দেহে নতুন উন্মাদনা;
পুরুষ আপিশ যায়—
নারী পিছন থেকে পথ চায়,
আপন মনে বলে—আমি যে নারী,—
আকাশে কি প্রাণ বাঁচে?
খাঁচা আমার চাই।
সন্তানের কচি মুখে স্তনের সুপুষ্ট কালো বৃন্তটি
আবেগভরে চেপে দিয়ে
চক্ষু তার নিমীলিত হ'য়ে আসে,
পুরুষ তখন আপিশে কাজ করছে॥

দ্বিচারিণী

গোপাল ভৌমিক

জনাকীর্ণ এ শহর:
অসহ্য গরম
সুদীর্ঘ সময় ধ'রে
চলে একটানা।
রৌদ্রদগ্ধ রাজপথ
যেন মধ্যরাত্রির সীমানা
পেরিয়ে চলেছে এই দিবা দ্বিপ্রহরে;
যদিও সকালে ঢুকে আপিশ-কোটরে
শান্তি খুঁজি কয়েক ঘণ্টার,
মনের বীভর
অস্বস্তির মাটি খুঁড়ে মরে
আর দেখে সারাদিন
কাক চিল ওড়ে
বৃষ্টির প্রত্যাশাহীন জলন্ত আকাশে—
বিলম্বিত কৃষ্ণচূড়া তবু কেন হাসে?

জানালার পাশে
একটি নিমের গাছ
হাওয়ায় দোলায় মাথা,
অকস্মাৎ হ'য়ে ওঠে নারী:
নরম সত্তায় তার
আপাতত সূর্যের সম্ভারই
নতুন চেতনা আনে,
যদিও বিবর্ণ পাতা
সবুজের স্বপ্ন দেখে দেখে,
তবু সে কামনা করে বৃষ্টির নিষেকে
ফিরে তার আসুক যৌবন—
দেহে হোক দ্বিচারিণী, একমুখী মন।

'মেঘদূত' ও তার অনুবাদ

সন্তোষ প্রতিহার

১

বিদ্যাসাগর বলেছেন, "যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোনো কাব্য রচনা না করিতেন তথাপি তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত।" মেঘদূত বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য এ-বিষয়ে সুধীসমাজে দ্বিমত নেই। অলৌকিক কবিত্বশক্তি, অসামান্য রচনাশক্তি ও অনন্যসাধারণ সহৃদয়তার যে একত্র সংঘটন বিদ্যাসাগরের মতে কালিদাসের বৈশিষ্ট্য, তার পরিচয় মেঘদূতে দেদীপ্যমান হ'য়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এক কবিতার বই সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ লেখক বলেছেন—a haunted book, কর্তৃবাচ্যের অর্থে ইংরেজিতে কর্মবাচ্যের প্রয়োগ হয়। এ কথাটার অর্থ হচ্ছে—a book that haunts। সকল শ্রেষ্ঠ রচনা সম্বন্ধেই এ কথাটা অল্পবিস্তর খাটে। তবে মেঘদূত সম্বন্ধে এ কথাটা যত খাটে অন্য কোনো বই সম্বন্ধে বোধ হয় তত খাটে না। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় ও প্রবন্ধে এর নিদর্শন রয়েছে। একবার মেঘদূত পড়লে তার রসের আস্বাদ আমাদের রসনায় লেগেই থাকে, এই কাব্যের আবেদনের কুহক কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব। মূল রচনার স্বাদ আমাদের রসনায় লেগে থাকে ব'লে অনুবাদকে ঐ কষ্টিপাথরে যাচাই করি। অনুবাদ প'ড়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে "চিনি ব'লে নিম খাওয়ালে, ঘুচলো নাকো মুখের তেতো"।

মেঘদূতের অনুবাদে দুরূহতার সম্বন্ধে সচেতন থেকে তার বিচার করতে হবে। এ-কথা মনে রাখতে হবে যে শ্রেষ্ঠ কাব্যে বাক্ ও অর্থের মিলন হর-গৌরীর মিলনের মত অভেদাত্মক। সুতরাং অর্থকে বাক্ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তার স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই জন্য শ্রেষ্ঠ কাব্যের অনুবাদে খানিকটা কাব্য-কসরতের (tour-de-force) ভাব থাকা স্বাভাবিক। যে-রচনার আবেদন শুধু বুদ্ধির কাছে তার অনুবাদ সহজ। যে-অর্থ শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য তার প্রকাশের জন্য প্রয়োজন ধীময়ী বাক্, কিন্তু যে-অর্থ বোধিগ্রাহ্য তার প্রকাশের

জন্য শুধু ধীময়ী বাক্ যথেষ্ট নয়, তার উপযোগী বাক্ হচ্ছে শ্রীময়ী, হ্রীময়ী, বিভ্রমময়ী। যক্ষ বলেছে, "স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু"। বনিতা সম্বন্ধে এ-কথা যেমন খাটে কবিতা সম্বন্ধে তেমনি। কবিতা অর্থপ্রকাশ করে হাবেভাবে, আকারে ইঙ্গিতে। বিধাতার সৃষ্টির মতো কবির সৃষ্টিও যেন "স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে, বলিতে পারে না স্পষ্ট করি, অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।" শ্রেষ্ঠ কাব্যের অনুবাদ এই অব্যক্ত ধ্বনির (suggestion) অনুবাদ। মেঘদূতের অনুবাদ করা সাহসের কাজ। এতে অনুবাদককে যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'তে হয় তাতে উত্তীর্ণ হওয়া একটা বড় রকমের কৃতিত্ব।

২

বুদ্ধদেব বসুর মেঘদূতের অনুবাদ অবিকল। মূলের সঙ্গে তিনি কিছু জোড়েন নি, মূলের কিছু তিনি ছাড়েন নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূতের অনুবাদ বিখ্যাত ও উপভোগ্য, তা এখন অপ্রচলিত। অবিকল অনুবাদের চেষ্টা তিনি করেন নি। একটি শ্লোকের প্রথম দুটি চরণের তাঁর অনুবাদ নীচে দেওয়া হল।

পার্শ্বে এক সরোবরে, জল থই থই করে
শোভে তাহে নলিনীর হাট।
উহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে
রমণীয় মণিময় ঘাট॥

বাসী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্যনালৈঃ।

জল থইথই করে, মূলে নেই। সুবর্ণ নলিনীর ও স্নিগ্ধবৈদূর্যনালের কথা অনুবাদে নেই। এই দুটি চরণের বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদ হচ্ছে—

রয়েছে দিঘি এক, ঘাটের সারি যার কঠিন পাষাণে বাঁধানো,
হৈম অম্ভোজ কত না ফুটে আছে, মৃণালে জড়লে বৈদূর্য।

এ-অনুবাদে মূলের কিছুই বাদ যায় নি। 'বদ্ধসোপানমার্গা' ও 'ছন্না'র অবিকল কিন্তু খাঁটি বাংলা অনুবাদ মন হরণ করবে।

অবিকল হ'লেও এ অনুবাদ আক্ষরিক নয়। আক্ষরিক অনুবাদ অনুবাদের প্রহসন মাত্র। "মরম না জানে ধরম বাখানে" এমন ধার্মিক ব্যক্তি যে-দলের, মরমে প্রবেশ না-ক'রে শব্দের অনুবাদ যে করে সে-ও সেই দলের। তারা এই মহাসত্য ভুলে যায় যে the letter killeth। কাব্যের মর্মের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বুদ্ধদেববাবু তাঁর অনুবাদ রচনা করেছেন। কাব্যের অন্তরের কথা তাঁর অনুবাদে ধরা পড়েছে। নীচে একটি শ্লোকের অনুবাদ দেওয়া হল। এই থেকে তাঁর অনুবাদের পদ্ধতিটা ধরা যাবে।

কামের উদ্রেক যে করে সেই মেঘে সহসা দেখে তার সমুখে
যক্ষ কোনোমতে চোখের জল চেপে ভাবলে মনে-মনে বহুখন;
নবীন মেঘ দেখে মিলিত সুখীজন, তারাও হ'য়ে যায় অন্যমনা,
কী আর কথা তবে, যদি সে দূরে থাকে যে চায় কণ্ঠের আলিঙ্গন।

শ্লোকের অর্থটি তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝেছেন ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। অনুবাদক যেন মূলের কঠিন ভাষাকে আগে গলিয়ে অর্থটি তরল ক'রে নিয়েছেন, তারপর তাকে নিজের ছাঁচে ঢেলেছেন। মূলের সঙ্গে অনুবাদটি মিলিয়ে নেওয়া দরকার। কৌতুকাধানহেতোঃ—কামের উদ্রেক যে করে; কথং—কোনোমতে; অন্তর্বাষ্পঃ—চোখের জল চেপে; চিরং—বহুক্ষণ; কিং পুনঃ—কী আর কথা তবে; দূরসংস্থে—যদি সে থাকে দূরে; কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে—যে চায় কণ্ঠের আলিঙ্গন; মেঘালোকে—নবীনমেঘ দেখে, সুখী—মিলিত সুখী জন। মূলে নেই অনুবাদে এমন কথা তিনটি রয়েছে—সহসা, নবীন, মিলিত। কথাগুলি না-থাকলেও ভাবটি মূলে রয়েছে। অনুবাদককে হ'তে হবে ভাবগ্রাহী; তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে কথার উপর নয়, ভাবের উপর। বুদ্ধদেববাবু ভাবের আনুগত্যকে ভাষার আনুগত্যের উপরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ পড়লে মনে হয় কালিদাস যদি আধুনিক বাঙালী কবি হতেন তাহলে তাঁর মনের কথা তিনি এই ভাবে এই ভাষায় প্রকাশ করতেন। মূলের সঙ্গে সূক্ষ্ম পার্থক্যের ফলে বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদ যেন আরো মূলানুগামী হয়েছে। তাঁর অবিকল অনুবাদের মধ্যে এই সূক্ষ্ম কারুকার্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নীচে এ-রকমের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। ক্ষণপরিচিতঃ—ক্ষণেক দেখে

নিয়ো; পাদন্যাসৈঃ—নাচের তালে-তালে; চিরবিলসনাৎ—ঝলক তুলে-তুলে অনেকবার; জ্ঞাতাস্বাদঃ—বারেক পেলে স্বাদ; ঊর্মিহস্তা—ঢেউয়ের মুঠি তুলে; সোপনত্বং কুরু—ধাপে-ধাপে এলিয়ে দিয়ে তনু; শিঞ্জাবলয়সুভগতালৈঃ—ক্বণিত বলয়ের ললিত করতালে। কোনো-কোনো জায়গায় অনুবাদ আমাদের সকল প্রত্যাশা ছাড়িয়ে এতো উপরে উঠেছে যে আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হই। এ-ধরনের প্রেরণাদীপ্ত অনুবাদের আরো উদাহরণ—করণবিগমাদ্ ঊর্ধ্বং, মরণ-পরপারে; অন্তস্তোয়ং;—স্বচ্ছ ভূমিতল সজল মনে হয়; জ্যোতিশ্ছায়াকুসুম-রচিতানি, তারার ছায়া দেয় ছড়িয়ে ফুলদল।

৩

চলতি, হাল্কা, খাঁটি বাংলায় মেঘদূতের মত দুরূহ রচনার অনুবাদের জন্য অঘটনঘটনপটীয়সী প্রতিভার প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর রচনায় সরলতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মেঘদূতের দুরূহতাদোষের কথা বলেছেন। মেঘদূতের দুরূহতার প্রধান কারণ অন্বয়ের (syntax) জটিলতা। দূরান্বয় ও দুরন্বয়ের একটা সেরা নমুনা হিসেবে নেওয়া যেতে পারে মেঘদূতের প্রথম শ্লোকটি যার পাশাপাশি স্থান পেতে পারে মিলটনের বিখ্যাত periodic sentence (ব্যূহবদ্ধ বাক্য), তাঁর মহাকাব্যের প্রথম অনুচ্ছেদ। যক্ষ ও তার কান্তার মধ্যে যে-দুস্তর ব্যবধান, এখানে কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে সেই ব্যবধান। কোথায় কশ্চিদ্ যক্ষঃ আর কোথায় বসতিঃচক্রে। মেঘদূতের পদসংঘটনা বা রীতিকে অলংকারশাস্ত্রের ভাষায় গৌড়ী রীতি বলা যায়। গৌড়ী রীতি সমাসবহুল। গৌড়ী রীতি বাঙালী কবির রচনার ভাষায় দেখা গেলেও বাঙালীর রসনার ভাষায় দেখা যায় না। বাঙালীর মুখের ভাষা সন্ধিবিমুখ, সমাসবিরাগী। কোনো বাঙালী কবি বলেছেন—

কাব্য যেমন কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো,
সহজ লোকের মতোই যেন
সরল গদ্য কয় গো।

সহজ লোকের সরল ভাষায় বুদ্ধদেববাবু মেঘদূতের অনুবাদ করেছেন, আমার কাছে তাঁর অনুবাদের এইটিই প্রধান আকর্ষণ। সংস্কৃতের বাংলা অনুবাদের কাঁধে সংস্কৃতের ভূত প্রায়ই চ'ড়ে থাকে। বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদে সংস্কৃতের উৎপাত নেই। পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ দশার্ণাঃ—এর রবীন্দ্রনাথ বাংলা করেছেন—

পরিণতফলশ্যামজম্বুবনচ্ছায়ে,
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে?

'পরিণতফলশ্যামজম্বুবনচ্ছায়ে' বাংলা দেশের সহজ লোকের মুখের সরল কথা নয়। যে-বাংলা বিভক্তিবিহীন সংস্কৃত সে-জাতীয় বাংলা বুদ্ধদেববাবু বরাবর এড়িয়ে চলেছেন। চলতি ভাষা ও চলতি ভাষার স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল অন্বয় তিনি আগাগোড়া অনুসরণ করেছেন।

প্রসাদগুণ বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। শুকনো কাঠে যেমন আগুন ছড়িয়ে পড়ে তেমনি প্রসাদগুণবিশিষ্ট রচনার অর্থটি অতি ত্বরিত-গতিতে মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পড়ামাত্র এ-অনুবাদের মানেটি বোঝা যায়। কালিদাস গম্ভীরা নদীর স্বচ্ছ জলের সঙ্গে প্রসাদগুণবিশিষ্ট মনের (চেতসি ইব প্রসন্নে) তুলনা করেছেন। লেখকের মনে প্রসাদগুণ না-থাকলে তাঁর রচনায় প্রসাদগুণ আসতে পারে না। রচনার স্বচ্ছতা মননের স্বচ্ছতার প্রতিবিম্ব। প্রসাদগুণবিশিষ্ট রচনার অর্থটি তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করা সত্ত্বগুণের ধর্ম (সত্বং প্রকাশকং)। প্রকাশের পথে বাধা অনেক—রজোগুণের বাধা, তমোগুণের বাধা! বিক্ষিপ্ত মনের আবিলতা, বিমূঢ় মনের মলিনতার আবরণ ভেঙে মনকে নিরাসক্ত, মোহমুক্ত না-করলে সত্ত্বগুণকে জাগানো যায় না। যা আবরক তার ঊর্দ্ধে না-উঠলে যা প্রকাশক তার সন্ধান পাওয়া যায় না। দেশ-বিদেশের সাহিত্য প'ড়ে বুদ্ধদেববাবু তাঁর মনোমুকুরকে মেজে-ঘ'ষে ধুয়ে-মুছে চকচকে ক'রে রেখেছেন। তাই তাঁর মেঘদূতের অনুবাদে আমরা সর্বত্র প্রসাদগুণ দেখতে পাই।

বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদের একটি বৈশিষ্ট্য যেমন তার প্রসাদগুণ, তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য শ্লেষগুণ। গৌড়ী রীতির দোষ হচ্ছে তার দুরূহতা, কিন্তু এই দোষ

সত্ত্বেও গৌড়ী রীতি কবিদের কাছে আদরণীয় তার প্রগাঢ়তার জন্য (ইষ্টং বন্ধগৌরবাৎ)। চরিত্রে দোষগুণের মত রচনারীতির দোষগুণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যা দোষ তাই আবার গুণের উল্টো পিঠ, দোষ বাদ দিতে গেলে গুণও চ'লে যায়। দুরূহতা বাদ দিতে গেলে রচনা প্রগাঢ়তা হারিয়ে ফেলে। সন্ধি-সমাসের সাহায্যে শিথিলবন্ধ রচনাকে সহজেই অর্থঘন গাঢ়বন্ধ ক'রে তোলা যায়। এটা বুদ্ধদেববাবুর অসামান্য কৃতিত্ব যে তিনি দুরূহতা দূর করেছেন অথচ শিথিলতা এড়িয়ে চলেছেন। যে-কবিকৌশলে দুরূহতা ও শিথিলতা দু-ই এড়িয়ে চলা যায় তা তিনি আয়ত্ত করেছেন। লোকোত্তর পুরুষের চরিত্রে যেমন শুধু গুণগুলি থাকে কিন্তু গুণের আনুষঙ্গিক দোষগুলি থাকে না, শ্রেষ্ঠ রচনারীতিতেও তেমনি গুণগুলি থাকে কিন্তু আনুষঙ্গিক দোষগুলি থাকে না। এই রকম রচনারীতিকে "সমগ্রগুণা" বলা হয়। বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদে প্রসাদ ও শ্লেষ দুই গুণের সমন্বয় ঘটেছে। শ্লেষগুণসম্পন্ন রচনায় শব্দগুলিকে সমাসবদ্ধ ক'রে একপদে পরিণত করা হয় না, অথচ এমন একটি অদৃশ্য বন্ধনরজ্জু দিয়ে তাদের বাঁধা হয় যে পদগুলি বহু হ'লেও একপদ ব'লেই প্রতীয়মান হয় (বহুন্যপি পদানি একবদ্ ভাসন্তে)। মেঘদূতে এমন চরণ রয়েছে যা একটিমাত্র শব্দ (word)। বুদ্ধদেববাবুর এই চরণগুলির অনুবাদ দেখলেই বুঝতে পারা যাবে কেমনভাবে তিনি সমাসবিহীন ভাষায় সমাসবদ্ধ ভাষার প্রগাঢ়তা রক্ষা করেছেন। বীচিক্ষোভসূনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ,—'ঢেউয়ের সংঘাতে মুখর বিহগেরা রচনা করে তার কাঞ্চীদাম।' অনুবাদে মূল থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি নেই, বিন্দুমাত্র বেশি জায়গা নেয়নি, কাঞ্চীদামে ছাড়া কোথাও সমাসের নাম-গন্ধ নেই। শব্দগুলি দেখতে বিশ্লিষ্ট, সন্ধিসমাসের দড়িদড়া দিয়ে সেগুলিকে বাঁধা হয়নি কিন্তু শব্দগুলির বিন্যাসকৌশল তাদের সংশ্লিষ্ট ক'রে রেখেছে। এখানে সেই শ্রেষ্ঠ কলাকৌশল রয়েছে যা কৌশল ব'লে টের পাওয়া যায় না। আগাগোড়া দেখা যাবে বুদ্ধদেববাবু তাঁর অনুবাদকে শুধু হাল্কা নয়, ঘন করার প্রয়াস পেয়েছেন। এমন হাল্কা অথচ এমন ঘন বাংলায় মেঘদূতের অনুবাদ করা যেতে পারে তা আমরা কখনো ভাবিনি।

৪

কাব্যের অনুবাদ সার্থক হয় তখনি, যখন অনুবাদক হন কবির সমানধর্মা। কাব্যের আত্মা রস। অনুবাদককে এই রসকে পাঠকের কাছে পৌছিয়ে দিতে হবে। "রসনাদ্ রসঃ"—আস্বাদ্যমানতা আছে ব'লেই রস বলা হয়। অনুবাদকের চিত্তে মূল কাব্যের রসের আস্বাদের অঙ্কুরোদ্গম না-হ'লে অনুবাদ রসাত্মক হ'তে পারে না। যখন তাঁর চিত্তে আস্বাদের অঙ্কুরোদ্গম হয় তখন অনুবাদ হ'য়ে ওঠে "স্বাদু স্বাদু পদে পদে"। ভক্ত যেমন হৃদয়ের ভক্তির সঞ্জীবনী রসে কাঠের পুতুলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে প্রাণের ঠাকুরে পরিণত করেন, অনুবাদকও তেমনি "ইহা গচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ" এই ব্যাকুল আহ্বানে মূল কাব্যের প্রেরণাকে অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে অনুবাদকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলেন। বসন্তে তরুলতা যেমন ফলে ফুলে পল্লবে অপূর্ব শোভা ধারণ করে, মূল কাব্যের পরিচিত অর্থ অনুবাদকের অন্তরের রসে অভিষিক্ত হ'য়ে তেমনি নূতনরূপে প্রতীয়মান হয়। কালিদাস আমাদের এই ধূলিময়ী ধরণীর কোলে যে-রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শের সম্পদ আবিষ্কার করেছেন তা আর কোনো কবি করেছেন কিনা জানি না। মেঘদূত পড়ার সময় মনে হয় যা-কিছু আনন্দ আছে বর্ণে গন্ধে গানে কবি তা সবই উপলব্ধি করেছেন। যে-ঋষিরা বলেছিলেন "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ", "মধুময় পৃথিবীর ধূলি", তিনি তাঁদের সমগোত্রীয়। যে-পৃথিবীতে এতো ঐশ্বর্য, এতো মাধুর্য, সে-পৃথিবীর অধিবাসীরা তো দিব্যধামবাসী। কালিদাসের উপলব্ধি যে-অনুবাদকের অন্তরে নবজন্ম লাভ করেছে তা নীচের দু-চার ছত্রের অনুবাদ থেকেই বোঝা যাবে।

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ,
প্রান্ত ছেয়ে আছে আম্রবনরাজি, ঝলক দেয় তাতে পক্কফল।

তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং তোয়ং,
.....তীব্রসৌরভ রেবার জল,
.....বন্য গজমদগন্ধে ভরা।

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূঢ়ৈঃ,
নব কদম্বের সবুজাপিঙ্গল অর্ধবিকশিত বর্ণ।

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃসূচীভিন্নৈঃ,
সেখানে উদ্যানে কেতকী ফুটে উঠে পাণ্ডু ক'রে দেবে সাজানো বেড়া।

ত্বংসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ,
তোমার মিলনের পুলকে থরে-থরে মুঞ্জরিত হবে কদম্বেরা।

পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ,
তটজ বৃক্ষের জীর্ণ পাতা ঝরে পাণ্ডু ক'রে দিলো বর্ণ।

কীটস শেলিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর কাব্যের প্রতিটি ফাটলকে মণিতে ভরিয়ে দিতে। কাব্যের ফাটলকে কী ভাবে ঐশ্বর্যে ভ'রে দেওয়া যেতে পারে তার চূড়ান্ত নিদর্শন মেঘদূত। এ-কাব্যে রিক্ততা কোথাও নেই, একটি বিচিত্র পূর্ণতা কাব্যদেহের অঙ্গে-অঙ্গে সন্নদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। বুদ্ধদেববাবু তাঁর অনুবাদে এই পূর্ণতার স্বাদ সঞ্চারিত করেছেন।

৫

মেঘদূতের যে-শ্লোকগুলি কেউ-কেউ প্রক্ষিপ্ত মনে করেন অনুবাদে তাদের স্থান সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা প্রয়োজন। এ-রকম শ্লোক ছয়টি। তার মধ্যে তিনটি—দুটি উজ্জয়িনী সম্বন্ধে, একটি অলকা সম্বন্ধে—কালিদাসের রচনার দীন, অক্ষম অনুকরণ। এগুলি বর্জন ক'রে মল্লিনাথ প্রৌঢ় বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। বাকি তিনটিকে নিয়েই সমস্যা। মল্লিনাথ সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন কিন্তু সযত্নে তার টীকা করেছেন। এতে তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্লোকগুলি যদি কালিদাসের প্রতিভার লক্ষণাক্রান্ত ও কাব্যের অঙ্গীভূত বিবেচিত হয় তা-হ'লে এদের অনুবাদে স্থান হওয়া উচিত। মেঘদূতে কোনো শ্লোক কাব্যের অঙ্গীভূত কিনা তা স্থির করা একটু কঠিন। প্রথম পাঠে মনে হয় যে এ-কাব্যের অঙ্গসংশ্লেষ বড়ই শিথিল। মনে হয় এ-কাব্য বিচিত্র বর্ণনার সমষ্টি মাত্র। অলকার পথনির্দেশ একটা উপলক্ষ মাত্র, রামগিরি থেকে কৈলাস এই বিশাল ভূখণ্ডের নদী, গিরি, বন, নগর, জনপদ ও তীর্থক্ষেত্রগুলির বর্ণনাই যেন লক্ষ্য। মনে হয় শ্লোকগুলির মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগ নেই, প্রাণিদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যে-নাড়ির যোগ তা সেখানে নেই,

পুতুলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যে-দড়ির যোগ, তাদের মধ্যে আছে সেই বহিরঙ্গ-যোগ। আমাদের এই ধারণা যদি সত্য হ'ত তা-হ'লে মেঘদূত কালজয়ী গৌরব পেত না। ঐক্য কাব্যের প্রাণ। তাতে বৈচিত্র্যের স্থান আছে সত্য, কিন্তু সে শুধু ঐক্যকে পরিপুষ্ট করার জন্য। লর্ড অ্যাক্টনের এক ভিষগ্ বন্ধু বলেছিলেন যে তাঁর আয়ুর্বেদিক শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলার জন্য তিনি গিবন, গ্রোট ও মিলের ইতিহাসের বইগুলি পড়েছেন। সুশিক্ষিত ব্যক্তির মন বিশেষ অনুশীলিত ও বিচিত্র বিদ্যায় পরিশীলিত। শুধু একটি বিষয় অধ্যয়ন ক'রে যথার্থভাবে শিক্ষিত হওয়া যায় না। স্থায়ী রসকে পরিপুষ্ট করার জন্য বিচিত্র সঞ্চারী রসের প্রয়োজন। মেঘদূতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই কিন্তু সকল বৈচিত্র্যই ঐক্যের কঠিন সূত্রে বিধৃত। বৈচিত্র্যগুলি স্থায়ী শৃঙ্গাররসের অবিচ্ছিন্ন, অবিরল স্রোতে অদ্ভুত, করুণ, ভক্তি, শান্ত প্রভৃতি সঞ্চারী রসের তরঙ্গচাঞ্চল্য। কালিদাস ছবির পর ছবি সাজিয়ে মেঘদূত রচনা করেছেন। মেঘদূত পাঠকে আলেখ্যদর্শন বলা যেতে পারে। এই ছবিগুলি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিহীন স্বতন্ত্র ছবি নয়। কোনো মনস্বী ব্যক্তি বলেছেন—A beautiful landscape is a state of the mind. মেঘদূতের ছবিগুলি শুধু নদী-গিরি-নগর-জনপদের ছবি নয়, সেগুলি কামার্ত যক্ষের অন্তরের ছবি। মেঘদূতের ঐক্যসূত্রটি হচ্ছে কামার্ত যক্ষের দৃষ্টির ঐক্য। মল্লিনাথ যে-তিনটি শ্লোককে বাদ দিয়েছেন সেগুলিকে এই ঐক্যসূত্রে গাঁথা যায় না। বাকি তিনটি শ্লোককে এই ঐক্যসূত্রে গাঁথা যায় কিনা দেখে, তাদের রক্ষণ বা বর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পূর্বমেঘের যে-শ্লোকটি বাদ দেওয়া হয়েছে, শ্রী তন্ময় দত্ত তাঁর সুলিখিত পত্রে সেটি উদ্ধৃত করেছেন। এই শ্লোকটিতে চাতুর্য আছে, মাধুর্য নেই; চমক আছে, চমৎকারিত্ব নেই। পূর্বমেঘের শ্লোকসংখ্যা চৌষট্টি এবং উত্তর-মেঘের চুয়াল্ল, গণিতের এই পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে শ্লোকটিকে রাখা যেতে পারে। তা ছাড়া এ-শ্লোকটি মেঘদূতের কাব্যদেহে বেমালুম খাপ খায়। অভিশপ্ত রাজপুরুষকে কালিদাস রাজবিরহীতে পরিণত করেছেন। বিরহী যক্ষ

বিশ্বের সকল বিরহীর চিত্তদূত। বিরহের ভূমা তার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। কান্তা থেকে বিযুক্ত হ'য়ে সে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বিশ্বমানবের প্রতি তার অপার করুণা, মৈত্রীভাবনায় তার অন্তর "মোদিত-মধুর"। কোনো-কোনো সদাশয় ব্যক্তি কোনো দুরারোগ্য রোগে প্রিয়জনকে হারিয়ে ঐ রোগের চিকিৎসার উন্নতিসাধনের জন্য সর্বস্ব দান ক'রে থাকেন, যেন ঐ রোগে অন্য কেউ প্রিয়জনকে না হারায়। যক্ষ এই সদাশয় ব্যক্তিদের দলভুক্ত। যে-সুখভোগে সে বঞ্চিত, যে-ভোগসুখের জন্য সে উৎসুক, সকলে সেই সুখভোগ করুক এই তার আন্তরিক কামনা। মেঘের ডাকে ত্রস্ত সিদ্ধাঙ্গনাগণের কম্প্রদেহের ব্যস্ত আলিঙ্গন-সুখ সিদ্ধগণ লাভ করুক, এই ভাবনা বিরহী যক্ষের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত। সুতরাং প্রক্ষিপ্ত হলেও এ শ্লোকটি রক্ষণীয়।

উত্তরমেঘের যে-দুটি শ্লোককে মল্লিনাথ প্রক্ষিপ্ত বলেছেন তার একটির অনুবাদ বুদ্ধদেববাবু দিয়েছেন। আরেকটি বাদ দিয়েছেন। এ-দুটি শ্লোকে কালিদাসের হাতের স্পর্শ সুস্পষ্ট নয়। তবে "কেকোৎকণ্ঠাঃ", "প্রতিহততমো-বৃত্তিরস্যাঃ" এই কথাগুলির মধ্যে জাদু আছে। সারা বছরই অলকায় ময়ূর ডাকে এর মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, কিন্তু ডাকার সময়ে ময়ূরের ঊর্ধ্ব-প্রসারিত গ্রীবার ছবিটি সুন্দর ও যে-ভাষায় তা প্রকাশ করা হয়েছে তা আরো সুন্দর। অলকায় রজনীতে আলো-আঁধারের লড়াইয়ে আলো সকল সময় আঁধারকে ঠেকিয়ে রেখেছে এই ভাবটিও আমাদের মনকে স্পর্শ করে। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে অলকায় আনন্দাশ্রু ছাড়া অশ্রু নেই, প্রণয়কলহ ছাড়া কলহ নেই, যৌবনবেদনা ছাড়া বেদনা নেই, যৌবন ছাড়া বয়স নেই। "জগতের গিরিনদী সকলের শেষে" এই যে আশ্চর্য দেশ, এ শৃঙ্গারী যক্ষের কল্পিত রসময় জগৎ, যেখানে শৈশব, কৈশোর, বার্ধক্য প্রভৃতি বয়সের, প্রণয়বেদনা ও কলহ ছাড়া বেদনা ও কলহের প্রবেশ নিষেধ, যেমন রাগিণীতে বিবাদী সুরের প্রবেশ নিষেধ। এই শ্লোকটিকে এ-কাব্যের স্থায়ী শৃঙ্গাররসের আস্বাদাঙ্কুর, কন্দ বা বীজ ব'লে মনে করা যেতে পারে। এ-শ্লোকটির অনুবাদে স্থান হওয়া উচিত।*

* উল্লিখিত শ্লোক দুটির অনুবাদ 'কালিদাসের মেঘদূত' পুস্তকে যোগ করা হয়েছে।

৬

এ-অনুবাদের একটা বড় আকর্ষণ এর ছন্দ। মন্দাক্রান্তা ছন্দের বাংলা অনুবাদে বিজোড় মাত্রার ছন্দের আশ্রয় নিতে হবে—এই বোধ প্রতিভাবান ছান্দসিকের অন্তর্দৃষ্টির ফল। এক ভাষার ছন্দকে অন্য ভাষায় চালানোর চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়, কেননা এক ভাষার স্বধর্মকে অবলম্বন ক'রে অন্য ভাষার ছন্দ অনুকরণ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজি blank verseকে বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দে পরিণত ক'রে মধুসূদন অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ভাষার, বাঙালীর উচ্চারণপদ্ধতির নিয়মকানুন মেনে নিয়েই তিনি বাংলা অমিত্রাক্ষর রচনা করেন, বাংলা অমিত্রাক্ষর বিলেতি iambic pentametre-এর দেশী সংস্করণ নয়। জোড় মাত্রায় বাংলা পর্বকে নানাভাবে মিশিয়ে তা রচনা করা হয়, তার মধ্যে কোথাও জবরদস্তি নেই। সত্যেন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তা ছন্দকে বাংলায় আমদানি করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মত ওস্তাদের হাতেও এ-চেষ্টা সফল হয়নি। মন্দাক্রান্তার চরণে যতিস্থান তিনটি; চার, দশ ও সতেরো অক্ষরের পর। মন্দাক্রান্তার চরণ ত্রিপদী। প্রথম দুটি পদে সত্যেন্দ্রনাথ আশ্চর্য সফলতা লাভ করেছেন, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি চরণে যতিস্থান চারটি, যার ফলে মন্দাক্রান্তার কাঠামোই ভেঙে গেছে, সংস্কৃতের তৃতীয় পদ বা পর্বটি বাংলায় দুটি পদ বা পর্বে পরিণত হয়েছে।

ইন্দ্রের দক্ষিণ। বাহু সে তুমি দেব। পূজ্য লও মোর। পূজার ফুল

প্রথম পর্বে চারটি হলন্ত অক্ষর (syllable), দ্বিতীয়টিতে পাঁচটি মৌলিক স্বরান্ত ও একটি হলন্ত—সংস্কৃতের প্রথম দুটি পর্বের চমৎকার অনুকরণ, মনে হয় সংস্কৃত মন্দাক্রান্তাই পড়ছি, কিন্তু বাকি অংশে মিল নেই। সত্যেন্দ্রনাথের মন্দাক্রান্তা কালোয়াতের কসরৎ। তাঁর ছন্দ উপভোগ্য এইজন্য যে তা বাংলা চতুষ্পদী চরণের ছন্দ যার মূল পর্ব বা পদ (basic foot) সাত মাত্রার, ব্যত্যয় আছে প্রথম ও শেষ পর্বে, প্রথমটিতে ৮ মাত্রা, শেষটি অপূর্ণপদী পাঁচ মাত্রার—এতে মাত্রার হিসাবে কড়াকড়ি রয়েছে, হলন্ত ও যৌগিক স্বরান্ত প্রতিটি অক্ষর দু

মাত্রার। সত্যেন্দ্রনাথের অবচেতন মন অস্পষ্টভাবে অনুভব করেছিল যে সাত মাত্রার অপূর্ণপদী চতুষ্পদী মন্দাক্রান্তার বাংলা প্রতিকল্প। বুদ্ধদেববাবু নিঃসন্দিগ্ধ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এই ছন্দ তাঁর অনুবাদে ব্যবহার করেছেন, তাঁর শেষ পদটি তিন, চার বা পাঁচ মাত্রার।

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দকে রক্ষা করা অসম্ভব। সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনির ঐশ্বর্য অতুলনীয়, তার তুলনায় বাংলা ভাষা রিক্ত। বাংলার পুঁজি হলন্ত অক্ষর ও মৌলিক ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর। শুধু এই পুঁজি নিয়ে সংস্কৃতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে না। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনির ঐশ্বর্যকে আত্মসাৎ করার ক্ষমতা বাংলা ভাষার মধ্যে লুকোনো ছিল, এই আবিষ্কার মধুসূদনের এক অপূর্ব কীর্তি। কিন্তু এ-ক্ষমতা রয়েছে শুধু অমিত্রাক্ষর পয়ারে; ছড়ার ছন্দের ও বিজোড়মাত্রার ছন্দে দৃঢ়ধ্বনি যুক্তবর্ণের বজ্র-করতালি নেই, এখানে বর্ণগুলি একত্র হয়, এক হয় না, চোখের কাছে যুক্ত (পঞ্চ), কানের কাছে বিযুক্ত (পন্+চ)। সুতরাং মনে হ'তে পারে মন্দাক্রান্তার অনুবাদ অমিত্রাক্ষর ছন্দেই হওয়া উচিত। কিন্তু এ-ধারণা ভুল। যে-monotone, ধ্বনির একটা প্যাটার্নের যে-পুনরাবর্তন মন্দাক্রান্তার প্রাণস্বরূপ, তা অমিত্রাক্ষরের বিচিত্র কনসার্টে লুপ্ত হ'য়ে যাবে। মন্দাক্রান্তা ঐক্যপ্রধান, ঢাকের বাদ্যির মত তার ঐক্য, বৈচিত্র্য সেখানে ঐক্যের প্রভাবে আচ্ছন্ন। মন্দাক্রান্তার ধ্বনি কাটা-কাটা, তার লয় বিলম্বিত। অমিত্রাক্ষরের প্রাণ তার প্রবহমানতার অখণ্ড কলধ্বনি, সে চলে দীর্ঘত্বরিত পদক্ষেপে উর্ধ্বশ্বাসে। ছড়ার ছন্দের লঘু পরিহাসের ক্ষমতা আছে, কিন্তু অশ্রু-সজল বিষাদগম্ভীর চিত্তভাব প্রকাশের ক্ষমতা তার সীমাবদ্ধ। এ-ক্ষমতা রয়েছে বিজোড় মাত্রার ছন্দের। এর লয় বিলম্বিত, এর গতি যতিবহুল। এর চরণ ও চলন সুনিয়ন্ত্রিত। পয়ারে ও ছড়ার ছন্দে অক্ষরের সংকোচন ও প্রসারণ দু-ই আছে। এখানে আছে শুধু প্রসারণ। সাত মাত্রার পর্বের বার-বার পুনরাবর্তন একটা মায়া ও মোহ সৃষ্টি করে যা মেঘদূতের সৌন্দর্যের অমরাবতীর দরজা খুলে দেয়। বিজোড় মাত্রার ছন্দ গদ্য থেকে দূরে, এখানে শব্দের উচ্চারণ একটু কৃত্রিম; এই কৃত্রিম ছন্দের যানে চ'ড়ে আমরা মেঘদূতের কৃত্রিম জগতে যেতে

পারি। সে-জগৎ কৃত্রিম কিন্তু তার সম্বন্ধে বলা চলে—"মনোহরাণাং সীমান্তরেখা", "অপরূপানাং অবসানভূমিঃ।"

৭

এ-অনুবাদের দোষত্রুটিগুলি সম্বন্ধে দু এক কথা বলা দরকার। এগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—বাংলা ভাষার অক্ষমতা, অনুবাদকের অক্ষমতা, ও অনবধান। বাংলা ভাষার অক্ষমতার জন্য অনুবাদককে দায়ী করা চলে না। সমাসের সাহায্যে অনেকখানি বক্তব্যকে গুটিয়ে এনে সংক্ষেপে সমস্ত পদে প্রকাশ করা যায়। বাংলায় বক্তব্যটি থাকে ছড়িয়ে, স্রস্ত হয়ে; সংস্কৃতের সমান আয়তনে বাংলায় বক্তব্যটিকে সকল সময় ধরানো যায় না; সুতরাং অশ্লিষ্ট বাক্যখণ্ডের মধ্যে বক্তব্যকে গূঢ় (obscure) অবস্থায় রাখতে হয়, ব্যাখ্যা না-করলে যার অর্থ বোঝা যায় না। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল

মহিমা অবসান, বিরহগুরুভার ভোগ্য হ'লো এক বর্ষকাল।
স্রস্ত কুন্তলে রুদ্ধ বিস্তার, স্নিগ্ধকজ্জলশূন্য।

সংস্কৃতে মন্দাক্রান্তা শ্লোককে চার চরণের বাংলা চতুষ্পদী স্তবকে অনুবাদ করতে গেলে এ-ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী।

'তা ভেবে, অভিমানবশত' (৯৭), 'কিংবা বন্ধুতাসূত্রে', (১১৮) এগুলি মন্দাক্রান্তার অনুবাদে একেবারে অচল, এ-কথাগুলি চলতি বাংলাতেও অচল। যে-সব জায়গায় অনুবাদ আমার কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দিলাম। সেবক ইন্দ্রের (৬), দিশারী (২১), ক্ষুব্ধ মৎস্যের আঘাতে (৯৮), সোচ্চারে (১০৬)।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলি নির্বিচারে লঙ্ঘন করতে হবে, এটা কুসংস্কার-আচ্ছন্ন মনোভাব। অবিধবা ও চটুলনয়নাকে সম্বোধন করতে হ'লে সংস্কৃত ভাষার সম্বোধনপদই ব্যবহার করতে হবে, প্রাকৃত ভাষার সম্বোধনে তাদের সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আমার মতে এ-অনুবাদের একটা গুরুতর ত্রুটি হচ্ছে চরণান্ত মিলের অভাব। বাংলা কবিতায় অন্ত্য মিল অপরিহার্য; অমিত্রাক্ষর ছন্দে মিল

না-হ'লেও চলে, তার কারণ সেখানে অনুপ্রাস, যমক ও যুক্তবর্ণের প্রাচুর্যে ধ্বনির যে-সমারোহ থাকে তাতে মিলের অভাবের ক্ষতিপূরণ হয়। ধ্বনিসম্পদে বাংলা ভাষা অকিঞ্চন, এতে সংস্কৃতের দীর্ঘস্বর নেই, ইংরেজির accented syllable নেই; তার উপর যদি মিল না থাকে তা হ'লে বাংলা কবিতা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। মিল না-থাকলে মনে হয় গান যেন শমে আসার আগেই থেমে গেল। মিল থাকলে কথা শেষ হ'য়েও শেষ হয় না। Rhyme-এর music সম্বন্ধে বলা চলে—

The music in my I bore
Long after it was heard no more.

যে-মিল শুধু শ্রোত্ররসায়ন, যার আবেদন শুধু কানের কাছে, মনে যার ছোঁয়া লাগে না তার ফলে কবিতায় যে অতিলালিত্য আসে তাতে রসের অপকর্ষ ঘটায়। সে-রকমের মিল না-রাখাই উচিত। যে-রসের অভিব্যক্তির জন্য উদাত্তগম্ভীর ধ্বনির প্রয়োজন মিলের লালিত্য সেখানে বর্জনীয়, কিন্তু মেঘদূতের করুণ বিপ্রলম্ভের মত অতি-সুকুমার রসের অভিব্যক্তিতে মিলের লালিত্য মাধুর্য সঞ্চার করবে, মিল হবে "ভূষণং ন তু দূষণম্"। আরেকটা কথা। আমার মনে হয় এই ছন্দে শেষ পর্বটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঁচ মাত্রার হওয়া উচিত, তিন মাত্রা ও চার মাত্রার পর্ব হবে নিয়মের ব্যতিক্রম, থাকবে শুধু বৈচিত্র্যের জন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষ পর্বটি তিন ও চার মাত্রার হলে, শুধু শেষ পর্বটি নয়, সমস্ত চরণটিকেই অপূর্ণ মনে হয়। নীচের দুটি চরণ তুলনা করলেই পার্থক্যটা বোঝা যাবে।

অদূরে কমনীয়। বকুল তরু আর। কম্প্র কিশলয়। রক্তাশোক
যেথায় মুকুরিত। তোমার তাড়নায়। পীড়িত ইন্দুর। দৈন্য

পর্বান্ত মিল (middle rhyme) থাকলে চরণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির রূপ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে ও ধ্বনি বেশ দানা বাঁধে। যেমন—

প্রান্তে আছে তার আমারি কান্তার পালিত কৃত্রিম পুত্র
আমার মনে হয় স্নেহের উপচয় মহৎ প্রেমে পায় পরিণাম।

এই পর্বান্ত মিল আরো বেশি থাকলে ভাল হত; উত্তরমেঘে পূর্বমেঘের চেয়ে অনেক বেশি রয়েছে। আরেকটা ত্রুটি, অনুবাদের নামকরণ: মেঘদূত নামই যথেষ্ট, "কালিদাসের মেঘদূত" বলার কি কোনো প্রয়োজন আছে?

অধিকাংশ ত্রুটি হচ্ছে নিছক অনবধানের ফল। এই ত্রুটিগুলির জন্য অনুবাদককে দোষী করতে আমি সংকোচ বোধ করছি, কেননা অনবধানের মূলে রয়েছে অনবসর। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধোত্তর পশ্চিমবঙ্গে জ্ঞানীগুণীদের জীবনে অবসর কোথায়? বীণাপাণি শতদলবাসিনী, সে-শতদল ফোটে অবসর-সরোবরে। সে-সরোবর আর যেখানেই থাক, বর্তমানের পশ্চিম বাংলায় নেই। শেলি বলেছিলেন, Hell is a city very much like London। এ-কথাটা এখনকার কলকাতা (আর কলকাতা মানেই পশ্চিম বাংলা) বিষয়ে বেশ খাটে। যে-দেশে জ্ঞানীগুণীদের জীবনে অবসর নেই তার চেয়ে ভয়াবহ নরকের কথা ভাবা যায় না।

হয়তো এই অনবসরের ফলে অনুবাদক দু এক জায়গায় শ্লোকের অর্থটি ঠিক-মত বোঝেন নি। গঙ্গীরা নদীর সম্বন্ধে দ্বিতীয় শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণের অনুবাদটিকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। 'মুক্ত করো সখা তট-নিতম্বের সরিয়ে দিয়ে নীল সলিল বাস'—এটা কি মুক্তরোধনিতম্বং নীলসলিল-বসনং হৃহার যথাযথ অনুবাদ? আগে থেকেই পশ্চিমশ্রোণিভাগের নীল বসন স্খলিত হ'য়ে গেছে। মেঘকে হরণ করতে বলা হচ্ছে পূর্বশ্রোণিভাগের শিথিল-হস্তে-ধৃত বসনপ্রান্তটি। পরের চরণের লম্বমান কথাটার অর্থসংগতি হয় শুধু পূর্বশ্রোণিভাগের বসন হরণের সঙ্গেই, নিতম্বের বসন হরণের সঙ্গে নয়।

দোষের কথায় সাহিত্যের আলোচনা শেষ করা শুক্তো খেয়ে ভোজ শেষ করার মত। কী আক্ষরিক, কী লাক্ষণিক কোনো ভোজেই "কষায়েন সমাপয়েৎ" নীতি অনুসরণ করা উচিত নয়। সাহিত্যসমালোচনা মূলত রসের কথা, কষের কথা নয়। শিল্পবিচারের নির্মম ক্ষমাহীন মানদণ্ড মেনে নিয়ে স্বীকার করতেই হবে দোষত্রুটি রয়েছে, কিন্তু এ-কথা সকল সময় স্মরণে রাখতে হবে যে অনুবাদে মূলের রস সৃষ্টি করার চেষ্টা সার্থক হয়েছে। এই ব'লে এ-আলোচনা শেষ করব—

মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার, তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার,
সুরে তবু লেগেছিলো।

'ল্য ফ্লুর দ্যু মাল' থেকে

শার্ল বোদলেয়ার

খুনের মদ

বৌটা ম'রে গেছে, আমি স্বাধীন!
এবার যত খুশি গিলবো খাঁটি।
ছিঁড়েছে টুঁটি তার কান্নাকাটি
ফিরেছি ফাঁকা টঁ্যাকে ঘরে যেদিন।

আকাশ নীল, মেলে বাতাস ডানা···
আমার মতো সুখী বাদশা নেই;
আমরা প্রেমে পড়েছিলুম, সেই
চৈত্রমাস মনে দিচ্ছে হানা।

বিকট তৃষ্ণায় হচ্ছি ক্ষয়,
মেটাতে সেই দাবি চাই এবার
মদের ধারা, যাতে কবর তার
ভরাতে পারে;—সে তো অল্প নয়।

দিয়েছি চাপা সব পাথর ভারি
প্রথমে ফেলে তাকে কুয়োর তলে;
ফিরবে না সে আর, পচবে জলে।
—ভুলতে চাই, যদি ভুলতে পারি!

বাতিল হয় না যা—সোহাগে মেশা
পুরোনো শপথের দোহাই দিয়ে
বলেছি, "হোক ফের নতুন বিয়ে
যখন দুয়ে ছিলো দুয়ের নেশা:

লক্ষ্মী, সেইমতো এসো না মিশি
আঁধার ঐ পথে, সন্ধে হ'লে !"
—এলো সে !—নির্বোধ কাকে বা বলে !
পাগল সকলেই, কম কি বেশি !

ক্লান্ত মুখ তার হঠাৎ দেখে
প্রেমের তল যেন খুঁজে না পাই—
তেমনি রূপ তার !—তখনি তাই
বলেছি : "বেরো তুই জীবন থেকে !"

বুঝবে কে আমাকে ?—অন্ধকারে
মাতাল কাঁপে যত যায় না গোনা,
কিন্তু মদে হবে কাফন বোনা
তারা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারে ?

নিরেট লম্পট, লোহায় ঠাশা
কঠিন, অচেতন কলের মতো—
গ্রীষ্ম, শীত ঘুরে আসুক যত—
কখনো জানবে না সে-ভালোবাসা,

ডাইনি-জাদু চলে সঙ্গে যার,
মিছিল নরকের অনর্গল,
বিষের শিশি আর চোখের জল,
হাড়ের, শিকলের ঝনৎকার !

—একলা অবশেষে, আমি স্বাধীন !
বেহুঁশ হবো মদে আজ রাতেই ;

ত্রাস কি অনুতাপ কিছুই নেই,
মাটিতে মাথা রেখে, চিন্তাহীন,

পশুর মতো ঘুমে দেবো গা-ঢাকা !
আসুক ছুটে জোর—ভয় না করি—
পাথরে জঞ্জালে বোঝাই লরি
দারুণ ভারি যার দামাল চাকা,

পাপের বাসা এই মাথার খুলি
দিক না পিষে, ধড় হোক দু-ফাঁক,
উড়িয়ে বিদ্রূপে দেবো বেবাক—
দেবতা, শয়তান, ধর্মবুলি !

বিষাদগীতিকা

কী এসে যায়, থাকলে তোমার সুমতি ?
হও রূপসী, বিষাদময়ী ! অশ্রুজল
নতুন রূপে করে তোমায় শ্রীমতী,
বনের বুকে ঝর্নাধারা যেমতি,
কিংবা ঝড়ে সঞ্জীবিত ফুলের দল।

পরম ভালোবাসি, যখন আনন্দ
তোমার নত ললাট থেকে গেছে স'রে ;
হৃদয় জুড়ে সংক্রমিত আতঙ্ক,
এবং তোমার বর্তমানে, কবন্ধ
গত কালের করাল ছায়া ছড়িয়ে পড়ে।

ভালোবাসি, আয়ত ঐ চক্ষু যখন
তপ্ত যেন রক্ত ঢালে জলের ফোঁটায়,

ব্যর্থ ক'রে আমার হাতের সাধ্যসাধন
অতি পৃথুল দুঃখ তোমার ছেঁড়ে বাঁধন—
নাভিশ্বাসের শব্দে যেন মৃত্যু রটায়।

নিশ্বাসে নিই—স্বর্গসুখের পরিমেলে—
এ কী গভীর স্তোত্র, মধুর আরাধনা!—
কান্না যত ওঠে তোমার বক্ষ ঠেলে;
ভাবি, তোমার হৃদয়তল দেয় কি জেলে
নয়ন দুটি ঝরায় যত মুক্তোকণা?

২

জানি, তোমার হৃদয় শুধু উগড়ে তোলে
জীর্ণ প্রেম, পরিত্যাগে প'চে-ওঠা,
আজো সেথায় কামারশালের চুল্লি জ্বলে,
এবং রয় লুকিয়ে তোমার বুকের তলে
মহাপাপীর অহমিকার ছিটেফোঁটা।

কিন্তু, শোনো, স্বপ্নে তোমার যতক্ষণে
না দেয় ধরা বিকট আভা নরকের,
এবং ডুবে অন্তহীন দুঃস্বপনে
না চাও বিষ, তীক্ষ্ণ ফলা মনে-মনে
বারুদ, ছোরা, কিংবা ছোঁয়া মড়কের,

না পাও ভয় দরজাটুকু খুলতে হ'লে,
করো নিখিল অমঙ্গলের পাঠোদ্ধার,
কেঁপে ওঠো, ঘণ্টা পাছে বাজে ব'লে—

জানলে না, কোন অপ্রতিরোধ অন্ধ বলে
আঁকড়ে ধরে কঠিন মুঠি বিতৃষ্ণার;

রানী, দাসী, সভয় তোমার ভালোবাসায়
তা না-হ'লে ফুটবে না এই উচ্চারণ
অস্বাস্থ্যকর আতঙ্কিত কালো নিশায়
আমার প্রতি পূর্ণ প্রাণের বিবমিষায়—
"রাজা! আমি তোমার সমকক্ষ এখন!"

ফোয়ারা

চারু চোখ দুটি বিষণ্ণতায় ভরা
প্রেয়সী, খুলো না, থাকো আরো কিছুখন!
অমনি উদাস ভঙ্গিতে দিক ধরা
হঠাৎ সুখের বিস্মিত শিহরণ।
উঠোনে ফোয়ারা মুখর, বিরতিহীন,
সারা দিনরাত মত্ত প্রলাপে ঝরে,
আজ সন্ধ্যায় যে-আবেশে আমি লীন
সে-রতিপুলকে আরো সে তীব্র করে।

ফুল্ল অঞ্জলি খুলে যায়,
হাজার মঞ্জরী ফোটে,
মুগ্ধ চন্দ্রমা মুরছায়,
রঙের সম্ভার লোটে,
অশ্রুবিন্দুর সমবায়
বৃষ্টিধারা হ'য়ে রটে।

এমনি কথনো তোমার অন্তরাত্মা
বিদ্যুৎময় বিলাসের দাবদাহে

মুগ্ধ, বিশাল নীলিমায় করে যাত্রা
ক্ষিপ্র, অধীর আবেগের উৎসাহে।
তারপর, যেন মৃত্যুর মুখে জীর্ণ,
ক্লান্ত ঢেউয়ের বিষণ্ণতায় ঝরে,
অদৃশ্য এক ঢালু বেয়ে অবতীর্ণ
হয় সে আমার হৃদয়ের গহ্বরে।

ফুল্ল অঞ্জলি খুলে যায়,
হাজার মঞ্জরী ফোটে,
মুগ্ধ চন্দ্রমা মুরছায়
রঙের সম্ভার লোটে,
অশ্রুবিন্দুর সমবায়
বৃষ্টিধারা হ'য়ে রটে।

হে তুমি, রাতের রূপসী, তোমার স্তনে
ঢেকে রেখে মুখ, কী মধুর শুধু শোনা,
এই শাশ্বত বিলাসের আবেদনে,
পাথরে প্রহত কান্নার মূর্ছনা।
জলকলস্বর, পুণ্য যামিনী, চাঁদ,
পল্লবদলে চঞ্চল শিহরণ,
তোমার শুদ্ধ বেদনার অবসাদ
আমার প্রেমের অবিকল দর্পণ।

ফুল্ল অঞ্জলি খুলে যায়,
হাজার মঞ্জরী ফোটে,
মুগ্ধ চন্দ্রমা মুরছায়,
রঙের সম্ভার লোটে,

অশ্রুবিন্দুর সমবায়
বৃষ্টিধারা হ'য়ে রটে।

প্যারিস-স্বপ্ন

১

ভীষণ দৃশ্য, স্বপ্নের অবদান,
থাকবে যা মর-মানবের অগোচরে,
তার স্মৃতিরূপ, সুদূর, বিলীয়মান,
এখনো, সকালে, আমাকে আকুল করে।

সৃষ্টি, তোমার জাদুবিদ্যায় দীপ্ত,
অলৌকিকের অনন্য আবেদনে,
সব উদ্ভিদ—প্রগল্‌ভ, প্রক্ষিপ্ত,
খেয়ালের বশে দিলাম নির্বাসনে,

আর, উদ্ধত প্রতিভার প্রত্যয়ে
রচিত চিত্রে পেলাম অভিজ্ঞান—
মর্মর, ধাতু, জলের সমন্বয়ে
উন্মাদনায় মোহন ঐকতান।

অসীম প্রাসাদ, বাবেল সুবিস্তীর্ণ,
সোপানে বিতানে ধাপে-ধাপে এসে নামে—
উৎস, ফোয়ারা, সরোবরে পরিকীর্ণ—
মলিন অথবা অরুণ কনকদামে;

আর, গুরুভার অনেক ঝর্নাধারা
ধাতুময় তটে ঝোলে গতিহীন বৃষ্টি,

স্ফটিকস্বচ্ছ পর্দার মতো তারা
বিচ্ছুরণের বিলাসে ধাঁধাঁয় দৃষ্টি।

তরুলতা নয়—স্তম্ভশিলার সারি
নিভৃত সায়রে তন্দ্রায় রাখে শান্ত,
দর্পণে যার, যেন মহাকায় নারী,
আত্মালোকনে দানবীরা বিশ্রান্ত।

গোলাপি, সবুজ তটের প্রান্ত ঘেঁষে
আলুলিত নীল সলিল সবিস্তার,
লক্ষ যোজনে ব্যাপ্তির পরিশেষে
বিশ্বলোকের সীমান্ত হয় পার।

মায়াময় ঢেউ, অজানা পাথরে গড়া,
স্তব্ধ সে-জলে পুঞ্জহিমের মতো,
যা-কিছু সেখানে ছায়ারূপে দেয় ধরা
তার উদ্ভাসে নিজেই মূর্ছাহত!

অনেক গঙ্গা, নির্বাক, উদাসীন,
দিগন্ত-জোড়া পাত্র উজাড় ক'রে
ঢেলে দেয় মণিরত্ন অন্তহীন
হীরকে রচিত পাতালের গহ্বরে।

পরিস্থানের স্থপতি, আমার সাধ্য
গড়ে মাণিক্যে সুড়ঙ্গ স্বেচ্ছায়,
যার তল দিয়ে—আমার আদেশে বাধ্য,
মহাসমুদ্র সম্যক ব'য়ে যায়;

সব হ'য়ে ওঠে ভাস্বর, দ্যুতিময়
কালো বরনেও ঝলসে ইন্দ্রধনু;
মহিমান্বিত তরলের পরিচয়
স্ফটিকে বদ্ধ রশ্মিতে পায় তনু।

সূর্য, তারার চিহ্ন দেখা না যায়
যদিও আকাশ দিগন্তে অবনত;
ঐ মায়ালোক জলে যার প্রতিভায়
সে-অনল শুধু আমারই ব্যক্তিগত।

আর এই মহাবিস্ময়ে অবিরল
ঝ'রে পড়ে (এ কী নিদারুণ নূতনত্ব!
শ্রবণে শূন্য, নয়নে অনর্গল!)
চিরন্তনের শব্দবিহীন সত্ত্ব।

২

খুলে যায় চোখ এখনো আগুনে জ্বলা,
সভয়ে তাকাই জঘন্য এই ঘরে,
অভিশাপ, খেদ, দুশ্চিন্তার ফলা
আবার আমার হৃদয় বিদ্ধ করে;

শবযাত্রায় স্বনিত পেণ্ডুলাম
বারোটা বাজায় পাশবিক ইঙ্গিতে,
নভতল থেকে তমসার পরিণাম
ঝরে বিষণ্ণ, মন্থর পৃথিবীতে।

এক শহীদ

খচিত গালিচা, ললিতবিলাসী সরঞ্জাম
এখনো তেমনি ব্যাপ্ত,
মর্মর, ছবি, গন্ধমদির বসনদাম
লাস্যে অপর্যাপ্ত,

উষ্ণ সে-ঘরে, যেথায় বাতাস কালান্তক—
যেন উদ্ভিদভবনে
পুষ্পপংক্তি কাচের কফিনে নিষ্পলক
শেষ নিশ্বাসপতনে,

প'ড়ে আছে শব, ছিন্ন মুণ্ডে রক্ত ঝরে
লাল, সপ্রাণ, দীপ্ত,
বালিশ ভিজিয়ে, উদার চাদর-তেপান্তরে
করে তৃষ্ণায় তৃপ্ত।

অমার প্রসূন, দুঃস্বপ্নের পাংশু রূপ
চোখে চেয়ে করে বিদ্ধ—
তেমনি মাথাটি, ছড়িয়ে নিবিড় কেশর-স্তূপ
রত্নমণিতে ঋদ্ধ,

নৈশ টেবিলে, মহার্ঘ এক অর্ঘ্যভার,
প'ড়ে আছে বিশ্রান্ত,
চিন্তারহিত, আর্ত নয়নে দৃষ্টি তার
শূন্য, ধূমল, সান্ধ্য।

আর শয্যায়, নগ্ন দেহের প্রদর্শনী
খুলে দেয়, নির্লজ্জ,
প্রকৃতির দান, মর্মান্তিক আকর্ষণী,
গোপনীয় সৌন্দর্য ;

এক পায়ে পরা গোলাপি মোজায় সে কার স্মৃতি
সোনার বিন্দুখচিত,
গোপন চক্ষু জ্বলে যেন তার কঠিন বৃতি
দীপ্ত হীরকে রচিত।

অলস, মহান নির্জনতার অঙ্গীকার
আঁকা এ-চিত্রপ্রতীকে,
যেমন কামোদ নয়ন, তেমনি ভঙ্গি তার
জাগায় তামসী রতিকে,

মনে আনে সুখ, চুম্বন আর দুষ্ট ক্ষত
নরকের উদ্বোধনে,
পর্দার ভাঁজে সাঁঝের বেড়ায় পিশাচ যত
তাদের তৃপ্তিসাধনে ;

তবু দেয় তার যুবতীদশার বিজ্ঞাপন
কাঁধের চকিত দর্প,
সুচারু কৃশতা, তীক্ষ্ণ কটির চটুল কোণ,
আর, যেন বাঁকা সর্প,

লীলায়িত দেহরেখার মাধুরী।—চেতনা তার
নির্বেদে শতছিন্ন,
আত্মাকে বুঝি দূষিত কামের অত্যাচার
ক্ষোভে করেছিলো দীর্ণ ?

জীবিত প্রণয়ে অসন্তুষ্ট কোন পুরুষ—
সে কি, অসূয়ায় আর্ত,
মৃত মাংসের 'পরে মহাকামে নিরঙ্কুশ
করেছিলো চরিতার্থ ?

এঁকেছিলো, তুলে ভীষণ মুণ্ড তপ্ত হাতে—
বল, ওরে অস্পৃশ্য !—
চুম্বন ক'রে নিথর কেশরে, ঠাণ্ডা দাঁতে
শেষ বিদায়ের দৃশ্য ?

—দূরে প'ড়ে থাক পরচর্চার ইতর সুখ,
উকিলের কড়াক্রান্তি,
অজ্ঞেয়া, তোর গহন শয়নে ঘুম নামুক
এবং শান্তি, শান্তি।

প্রেমিক ফেরারি ; তার ঘুম তোর চিরন্তন
প্রতিমায় হয় পিষ্ট ;
র'বে তার কাছে তোর একান্ত সমর্পণ
আমরণ একনিষ্ঠ।

পাঠকের প্রতি

মূঢ়তা, প্রমাদ, কার্পণ্যের পাপে
পূর্ণ হৃদয়, দেহ তিলে-তিলে ধ্বংসে,
ভিখিরি যেমন পোষে উকুনের বংশ
আদরে জোটাই খাদ্য মনস্তাপে।

দুর্মর পাপ, অনুতাপ সমস্ত,
ঘৃতান্নভোজে পণ্যের মূল্য মানি,
পচা কান্নায় ধুয়ে যাবে সব গ্লানি—
এই ভেবে, হেসে, ফের হই পঙ্কস্থ।

মূঢ় আত্মাকে দোলায় পাপের তল্পে
ত্রিগুণমায়াবী শয়তান, তমিষ্ঠ ;
সে-বিজ্ঞানীর বিদ্যায় হয় পিষ্ট
কোনো খাঁটি সোনা থাকে যদি সংকল্পে।

বীভৎসে বাঁধে রমণীয় নির্বন্ধে,
যেখানেই যাই, সে-পিশাচ টানে দড়ি !
দিনে-দিনে তাই নরকে গড়িয়ে পড়ি
আতঙ্কহীন, তমসার পূতিগন্ধে।

বুড়ি বেশ্যার শুকনো শহীদ-স্তনে
দীন লম্পট চুম্বনে করে দীর্ণ ;
আমরাও চাপি গোপন সুখের জীর্ণ
বাসি ফলে আরো কঠিন নিষ্পেষণে।

মগজে, মত্ত পিশাচেরা দল বাঁধে,
যেন কোটি কৃমি, ফেনময়, পরিকীর্ণ ;
নিশ্বাস নিই—ফুশফুশে অবতীর্ণ
অদৃশ্য নদী, মরণ, ফুঁপিয়ে কাঁদে।

হায়, আমাদের নেই যথোচিত দৃষ্টি,
নিয়তির পট তাই মালিন্যে মাখা,
ফোটাতে পারে না কোনো মনোজ্ঞ রেখা
ধর্ষণ, বিষ, ঘর-পোড়ানোর দীপ্তি।

কিন্তু পাপের জঘন্য সংসারে
যত শার্দূল, শৃগাল, শকুন, সর্প,
বৃশ্চিক, কীট, মর্কট করে দর্প
নেচে, কুদে, ফুঁশে উৎকট চীৎকারে,

সেই দলে এক রয়েছে পরম ঘৃণ্য—
হাঁকে না, ছোটে না, ব'সে থাকে একভাবে,
হাই তুলে যেন সৃষ্টিরে গিলে খাবে,
জঞ্জাল বিনা রাখবে না কোনো চিহ্ন ;

—নির্বেদ ! চোখে অনভিপ্রেত অশ্রু তার,
হুঁকো টানে আর ফাঁসিকাঠ ছাখে স্বপ্নে।
পাঠক, তুমিও চেনো এ-পিশাচরত্নে,
—কপট পাঠক,—দোসর—যমজ ভাই আমার !

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

এক গুচ্ছ রোদ

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

১. আততায়ী

গুচ্ছ-গুচ্ছ শুভ্র রোদ কোথা থেকে লাগলো তার হাতে
পশু-প্রেত সসন্তান সরীসৃপ চমকে দিয়ে সব ;
গহ্বরের পেয়ালায় নারী-নাচ, কেয়ার সৌরভ
(কৃত্রিম), ছড়িয়ে পড়ে, ইতস্তত, রক্তাক্ত সংঘাতে।
আততায়ী চিত্রার্পিত ; শূন্য ভ'রে শুধু রিভলভার,
হাতকড়া। হঠাৎ কার্তুজ নিয়ে ঘোচায় চিন্তার
মৌমাছির নিষ্ঠুরতা। দু-একটি ম্লান আলো জ্বলে—
রূপসী বৌটি ভাসে অন্তহীন রক্তের পল্বলে।

গ্রাম—অড়হর খেত ; কলহাসে শাপলা-পুকুর
কল্লোলিত। রক্তিম কুমুদ-বনে বালকের মুখ :
সেখানে কোথাও নেই আমাদের হৃদয়ের গহন অসুখ
ব্যথা দিতে—শুধু নীল অনশ্বর উজ্জ্বল ময়ূর।

২. কিম্পুরুষ

সুগম্ভীর সেনাপতি এসেছিল তার কুঁড়েঘরে।
শিশ্নোদর ভ'রে এক এনেছিল কঠোর আগুন,
মদিরাভ দুটি চোখে না জানি কী ছিলো তার গুণ,
নাগদন্ত শীর্ণ চাঁদ উঠেছিল সেদিন নগরে।

একটি অপূর্ব তারা কেঁপে-কেঁপে অনন্ত হিল্লোলে
নেচেছিল। কিম্পুরুষ বর্শা তুলে দেখে নাই তাকে ?
ধাবমান সে-নারীর দিকে চেয়ে বলেছে—'তোমাকে
বিদ্ধ করি। আমি সে-ই—লোকে যাকে অন্ধকার বলে।

হয়তো সে কোনোদিন—কতো রাত—ঘুমোবে না আর।
একটি সবুজ শাখা আলম্বিত মায়া দিয়ে ঘিরে ;
পুরোনো গানের টুকরো গুঞ্জরণ করে ধীরে-ধীরে,
উন্মাদিনী হেসে ওঠে ফুল সুদ্ধ খোঁপা নিয়ে তার।

৩. সুন্দরী

নর্দমার তীব্র নাচে ভেসে যায় বসন্তের ফুল।
বাড়ির বুরুজে আলো, তরুলতা শান্ত জানালায় ;
শ্বেতাভ চাঁদের দিকে ধূম্র এক গাছের আঙুল,
অজস্র অস্থির ইচ্ছা সুন্দরীর মুখের আপেল কুরে খায়।

কিছু দূরে রুপোলি ডাকের সাজে নদী ব'য়ে যায়,
তবু কেন ছায়া নামে চিত্রিত ভুরুর সিংহদ্বারে ?
রাশি-রাশি মৃতদেহ প'ড়ে থাকে চোখের কিনারে ?
সে যেন এখন ডুবে যেতে পারে ভালোবেসে গভীর কান্নায়।

বিধ্বস্ত ধনুক নিয়ে ক্লান্ত মেঘে সূর্য পড়ে হেলে,
নিপুণিকা, এমনি কি যাবে দিন ইয়ো-ইয়ো খেলে ?

পর্যাপ্ত

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

'তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিন্দূর'
পূর্বসূরীদের মনোহরণ করেছে।
কিন্তু এদের তো আমি চিনি,—
ছেলেবেলা থেকেই পরগললগ্না হবার প্রত্যাশী,
সযত্নে বাঁধা খোঁপাঢাকা ছোট্ট মগজে
অপরকে আঁকড়ে ধরবার সহজ পটুতা,
সেই একঘেয়ে রান্না, সাজগোজ, রাত্রির বাসর।
কাল আনে জরা, আনে না প্রজ্ঞার শান,—
এরই জন্য কত কবির "সর্বশেষের গান!"
ধন্য কবিরা। কী যে পান।'

আমি এ-যুগের মেয়ে।
রূপসী হ'লেও বাপের রুপোর নেই জোর।
সে-কথা জ্ঞান হবার সঙ্গেই জানা। তাই পড়াশুনো।
তবু কেমন ক'রে ভালোবেসেছি পুঁথিকেই,
এতেই মুক্তি মনের। জীবিকাও বটে (অর্থাৎ ইস্কুলমাস্টারি)।
বিয়ের আশা নেই। তিনটে ব্যর্থ প্রেমের মহড়া পেরিয়েছি।
প্রায় ডুবেছিলুম হতাশায়। কী কাণ্ড!
এই মনোজগৎ বাঁচালো আমায়। বললো, "ওঠো,
চোখ মেলে চাও এ-জগৎটার দিকে। কত অন্ধ,
বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠরোগীর মেলা এ-সভ্যতার প্রাঙ্গণে।
একে সুন্দর করো।"
এদিকে কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বয়স বাড়ে, মেজাজ রুক্ষ।...

"থামো! থামো!"—বিরক্ত ভাগ্যদেবতা বললেন,
"আর ফিরিস্তি বাড়িয়ো না। বর দেবো ইচ্ছাপূরণের।
পরজন্মে যা চাও, তাই। (অবিশ্যি যদি মানো।)"
স্বপ্নেই চমকে উঠি। বলি, "যদি পরজন্ম থাকে, হে প্রভু!
আবার যেন এ-যুগের মানুষ হ'য়েই জন্মাই,
কেবলমাত্র মেয়ে হ'য়েই নয়,—"
যার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিন্দুর।

অম্বালিকা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমার রোগা শরীরটা
বিস্রস্ত বিবর্ণ বিবশ হয়ে প'ড়ে থাকে বিছানায়
এতটুকু। তোমাকে ছুঁতে আমার ভয় করে।
একটি একটি পাঁজর গুনে গুনে যখন
শিশুর চোখের মতন মসৃণ কচি স্তন দুটিতে উপনীত হবো,
বুকের ওপর কান পেতে শুনবো
হয়ত তোমার রক্তেরা কথা ক'য়ে উঠেছে,
নাভিকুণ্ডলীর চারপাশে দুর্বল স্নায়ুতন্ত্রীগুলো
ছটফট করছে যন্ত্রণায়;
আর তুমি চোখ বুজে
আমার হিংস্র আক্রমণের প্রতীক্ষা করছো।
তুমি কি কিছুতেই বুঝবে না
একটিমাত্র দুঃস্বাদ চুম্বনে
তোমার রক্তের সঞ্চয় নিঃশেষে পান করতে পারি;
তোমার কাতর শীৎকার তখন শুনতেও পাবো না
শুনতে পাবো না অস্ফুট হাসির মতো তোমার কান্না।
তারপর হয়ত এক সময়
কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে তুমি হঠাৎ ম'রে যাবে—
ঠাণ্ডা নিরীহ এতটুকু শরীরটা
মৃত জন্তুর মতো লুটিয়ে থাকবে বিছানায়।

আকাশের জ্যোৎস্না সারা ঘরময় থুতু ছিটিয়েছে
জানলাটা বন্ধ করো, একটু ঘুমোই···
না—না—
অমন ক'রে মাঝরাত্রে আমায় জাগিয়ো না
তোমাকে ছুঁতে আমার ভয় করে॥

দুটি কবিতা

শান্তিকুমার ঘোষ

এস্‌কালেটর

এস্‌কালেটর বেয়ে প্রথম যেখানে মুখোমুখি দেখা
নয় কিছু রমণীয়, গোছা গোছা ফুল হাতে নেই ; কবিতার কলি
কাঁপন তোলেনি ঠোঁটে :
সূর্যহীন সুড়ঙ্গের বিদ্যুৎ-ধাঁধানো এক স্বচ্ছ অন্ধকার।

নিরুত্তাপ হিম রাত্রি—পথ যত ভেঙে গেছি আমার শূন্যতা ব'য়ে—
ঘিরেছে নিবিড় ক'রে। পথের ঘুরুনি বাঁক, উঁচু-নীচু, অনুরাগ ঘৃণা,
কৌতুকে উচ্ছল চোখ, অভ্যস্ত ছলনা, হাসি, সব ধুয়ে মুছে
তেলরঙ রূপ নেয় একখানা মুখ।

ঢেউ এসে বুকে লাগে শাদা, নীল, কালো।
আমারও পৃথিবী এই—অনন্তে আলোর বিন্দু—রহস্যের ঘের,
সমস্ত সত্তার স্রোতে আবেগ-কম্পন-তোলা নিরন্ত চেতনা :
যেখানে বস্তুর স্তূপ, শব্দের নির্ঝর বেগ, স্মৃতির বুনোন ;
উদ্দাম ব্যাঞ্জোয় সুর, নাচের আসরে ছায়া, লীলায়িত রূপ ;
কেমন ছুটন্ত সব অথচ কোথায় স্থির অদৃশ্যের কেন্দ্রে।

অবিরাম সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত ওঠা এই অস্তিত্বের অগ্নির ভিতরে,—
বর্ণছত্র ভেঙে ফের দৃশ্যাবলী দুই দিকে—গতিময় মেরুবিন্দু তারা :
কত পিছে সেও আসে—আসে তবু হাসি গান আনন্দবিস্তার ;
আভা ফেলে যায় মনে মুহূর্তের সঙ্গ যার সঙ্গের বেদনা।
নেতির বিলীন ভার, উধাও চলন্ত ধাপ—বিস্তৃত সময়।

ওয়াই ভ্যালি

মেঘ গেল ছায়া ফেলে তোমার সবুজ স্নেহ লাল মাটি উপত্যকা ঘুরে।
আনন্দ কি নদী এক বাঁক নেয় গিরিবর্ত্ম বনান্তের নীলে :
কেমন সহজ লঘু পাখির ডানার ছন্দ—ছন্দে দূর তরঙ্গিত টিলা মাঠ খেত।
ফলের মতন দেহ আতুর ঘুমের ভারে হাসি তবু রৌদ্রের ঝলক ;
তরুপল্লী নিবিড়তা অগাধ রোমাঞ্চ-নীল ভালোবাসা তারি উষ্ণ ছায়া।
ফেরিঘাট একা মেয়ে মুগ্ধ দৃষ্টি···বৃষ্টি ঘুম কুয়াশায় লীন।

সম্পূর্ণতা···ছুঁয়েছি কি রাত্রির যন্ত্রণা ক্ষত চড়াইয়ের শেষে॥

দুটি কবিতা

সুনীল সরকার

প্রথম ছোঁয়া চাই

পেলুম টলটলে মুক্তোফল
কালের গালে যেন বিন্দুজল।

তখন ভারি এক বুদ্ধি এলো :
আলোর ছুঁচে এর টুকরোগুলো
চমকে দিক্ এই কক্ষতল।

হ'লোও তা-ই। কিছু খ্যাপা প্রহর
কুড়িয়ে ফিরলুম কণিকা তার,
যতই খুঁজি, খাই হৃদয়দোল ;
হঠাৎ পণ করি : সেই নিটোল
প্রথম ছোঁয়া চাই মুক্তোটার।

পাখিটা

বা শূন্যবাদীর প্রতিভাষণ

তোমাদের ধারণাটা কাঁচা,
মনে ভাবো আত্মা এক পাখি
আর, দেহ তার খাঁচা।
আশা করো : খাঁচা খুলে পাখিটা ওড়াবে
বলি, ওড়াবে কোথায় ?

যে-আকাশে পাখা চলে সেটাও ঐচ্ছিক,
তাকে লোপ করা যায়।
এ-সৃষ্টির মানচিত্র যেই পূর্ণ হয়,
ওঠে অতলের ধ্বনি তা নয়, তা নয়…
এর কিছু কিচ্ছু নয়।
তোমার পাখিটা হ'লে মহাব্যোমে
সব-ঝাপটা-সওয়া,
মাধ্যাকর্ষে টেনে তাকে ধরবেই, নেবেই
নির্নাম না-হওয়া।

অপসরণ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

যখন স্মরণ করি কেঁপে উঠি এ-প্রৌঢ় বয়সে।
রক্তাতিসারের মতো সাংঘাতিক এখন প্রণয়
চল্লিশের প্রান্তে এসে, তার শুভ্র শরীরের রসে
নির্জনে আপ্লুত হ'য়ে সঞ্চারিত জরাকেই জয়
কখনো সম্ভবপর, ছিলো না ধারণা। রঙ্গালয়
যদিও জীবন, তবু কোনোদিন ভাবিনি রঙ্গিনী
হবে সে-ই আমার নাটকে। ভাবিনি বাসনাভয়
লগ্নশেষে জড়াবে হৃদয়। আমি কখনো দেখিনি

যৌবনের বিচিত্রিত এতো স্তূপ একটি শরীরে।
তাই মিতাচারী হ'য়েও নির্ভয়ে অতি সন্নিধানে
দেখেছি সন্নত দ্বীপে নক্ষত্রমিছিল। ধীরে ধীরে
যখন ঘুচেছে ভয় গন্ধবহ পদ্মের সন্ধানে

রেখেছি নির্ভীক চোখ উচ্চে নীচে শুভ্র সানুদেশে।
ভীত হ'য়ে তারপর স'রে গেছি সংযত স্বদেশে॥

স্মৃতি

দেবতোষ বসু

ভগ্নপক্ষ মেঘের বৈনতেয়
নীলাকাশে চিত্রার্পিত সম্প্রতি
উন্নতধ্বনি সমাগত আষাঢ়েও
খরবায়ু তাকে পাঠায় না আর গতি।
অদূরবর্তী কবন্ধ মরুমায়া
ভ্রান্তিবিলাসে নিরাশা ছড়ায় মনে,
পলাশ-স্মরণ মুখের স্নিগ্ধ ছায়া
সেও বুঝি শেষে গিয়েছে সহমরণে।
শুধু প'ড়ে আছে মৃত মাথুরের স্মৃতি
প্রতিবেশী হাওয়া ডেকে নিয়ে আসে তাকে
অতনুরুচির সুকুমার অনুভূতি
বিদ্রূপ করে বৃদ্ধ বিমূঢ়তাকে।

স্বপ্নবাহিনী ছত্রভঙ্গ আজ
অন্তরীক্ষে ওড়ে বেহিসেবি দিন
শূন্য তূণীরে তবুও তীরন্দাজ
লক্ষ্যভেদেই থাকে অন্তর্লীন।
প্রগত জলের মুখর সপ্তপদী
একদিন তাকে দিয়েছিলো ভালোবাসা,
দুই কূলে আজ ব্যবধান রচে নদী
জলদর্পণে মেলে না ঢেউয়ের ভাষা।

মেলাতে প্রান্ত প্রেমের সূত্রাকারে
যা-কিছু হয়েছে বলা সবই নশ্বর,
অনামিকা আজো নাম খোঁজে কান্তারে
দৃষ্টিসীমানা হারায় সবুজ চর।

নিসর্গে তুমি আজকে স্বপ্রকাশ ;
পশ্চাতে টানো আমাকেই বহুরূপে
তবু তো বুঝি না কেন পলাশের মাস
স্মৃতিকে বাঁধে না করুণ অনুষ্টুপে।
অথচ নদীতে প্রস্তুত স্রোতোবেগ
এবং হৃদয় সন্ধিতে বিশ্বাসী,
জলাভাবে মৃতকল্প আদিম মেঘ
স্বগতস্বপ্নে থাকে চিরউপবাসী।
অতএব এক ললাটলিখনই গতি
রক্ষাকবচই বরাভয় অবরোহে—
তাই অর্পিত প্রাণ খোঁজে সংগতি
আপাতত মেকি স্বর্ণসীতার মোহে॥

কবিতা-মেলা

যে-কোনো দেশের পক্ষেই কবিতা-মেলা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাংলা দেশে তো বটেই। গত সাতাশে, আটাশে ও উনত্রিশে বৈশাখ জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রভারতী-ভবনে যে-কবিতা-মেলা অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল, কবি কিংবা কবিযশঃপ্রার্থী অথবা কাব্যানুরাগী পাঠক—সবার কাছেই সেটি সমান আকর্ষণীয় হয়েছিলো। ছোটোখাটো সাহিত্যসভা নয়, বিগত কবির স্মৃতিসভা উপলক্ষে কবিতাপাঠ নয়, তেপ্পান্ন সালের সেনেট-হলে অনুষ্ঠিত 'কবিসম্মেলন' ছাড়া অন্য কোনো সম্মেলনের সঙ্গে যার তুলনা মনে পড়ে না, সেই তিনদিনব্যাপী কবিতা-মেলা আধুনিক বাংলাদেশের কাব্যচর্চা ও কবিতাপাঠের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা, সন্দেহ নেই। ত্রুটি যে কোথাও ছিল না, তা বলা চলে না, ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি চোখে পড়েছিলো ; শুক্রবার যাঁদের কবিতা পড়ার কথা ছিল, তাঁদের কারো-কারো পরের রাত্রির অনুষ্ঠানের আগে কবিতা পড়বার সুযোগ মেলেনি, কারো-কারো একেবারেই মেলেনি ; প্রথম দিনের প্রথম দিকে মাইকের গোলমালে 'প্রাচীন বাংলা কবিতাপাঠ' সবার কানে পৌছতে পারেনি ; কিন্তু কবিতা-মেলার সামগ্রিক এবং সন্দেহাতীত সাফল্যের তুলনায় এ-সব ত্রুটি অকিঞ্চিৎকর, এবং মার্জনীয়। আলো-জ্বলা মস্ত হল্-ঘরে সুদৃশ্য মঞ্চের ওপর তিনদিন বিভিন্ন কবিতাপাঠ ও নাটক অনুষ্ঠিত হ'লো। শ্রোতারা, বা যাঁরা কবিতা শোনালেন তাঁরা, যে সর্বদাই হল্ঘরের চেয়ারেই বসেছিলেন—তা নয়। কেউ-কেউ দল বেঁধে সামনের মাঠের ঘাসে ব'সে কবিতা শুনছিলেন, কেউ বা নানারঙের নানারকম কবিতার বই-সাজানো বইয়ের-স্টলে দাঁড়িয়ে পাতা উল্টেছিলেন বইয়ের। ওরই মধ্যে কাব্যগ্রন্থরচয়িত্রী কোনো বর্ষীয়সী মহিলা বুদ্ধদেব বসুর স্বাক্ষর-সংগ্রহের জন্যে আমার কাছ থেকে কলমটা ধার নিয়ে গেলেন। সব মিলিয়ে, বেশ একটা মেলা-মেলা ভাব।

কবিতা-মেলার পক্ষ থেকে শনিবার, আটাশে বৈশাখ, সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হ'লো, আমার মতো

অনেকের কাছেই এই ঘটনা অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়েছিলো। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই সংবর্ধনার পৌরোহিত্য-সূত্রে তাঁর স্বকীয় ভাবস্বচ্ছ ভঙ্গিতে এই দুই কবিকে অভিনন্দন জানালেন—বাংলা কবিতার বিবর্তন ও উন্নতির পথে 'কবিতা' ও 'পূর্বাশা'র, বিশেষত 'কবিতা'র, অবদান যে কতখানি, সে-সম্বন্ধেও তিনি শ্রোতাদের সচেতনতা দাবি করেছিলেন। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু অত্যন্ত ধীরে ধীরে সেদিন যে-ক'টি কথা উচ্চারণ করেছিলেন, তার বক্তব্য লেখকের রচনাসূত্রে আমাদের পরিচিত হলেও, কবিতা-মেলার ঐ আলোক-উদ্ভাসিত মঞ্চে, যাঁরা কবিতা পড়তে ভালোবাসেন একমাত্র তাঁদেরই উপস্থিতির পরিবেশে, অত্যন্ত তাৎপর্যময় মনে হয়েছিলো। আমরা, যারা কবিতা লিখি বা লিখতে চাই, মনে বল পেয়েছিলাম, মনে আছে। শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বক্তব্যও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিলো। দুজনেই কবিতা পড়েছিলেন।

সংখ্যায় প্রায় একশো আধুনিক বাঙালি কবির স্বরচিত কবিতা পাঠ ছাড়াও, অন্যান্য অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিলো প্রাচীন বাংলা কবিতা পাঠ—যেমন চর্যাপদ বা পদাবলী থেকে ; রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ—ডঃ নীহাররঞ্জন রায় আবৃত্তি করেছিলেন ; জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠ—পড়েছিলেন শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রী নীরেন্দ্র চক্রবর্তী ; বিদেশী কবিদের কাব্যপাঠ—জর্মান অধ্যাপক ডঃ গটফ্রীড ফিশার ও ফাদার আঁতোয়ান থেকে শুরু ক'রে লোকশ্রুত অভিনেতা শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যাল পর্যন্ত র‍্যাঁবোর কবিতা ও ইংরেজি অনুবাদ প'ড়ে শোনালেন। তদুপরি, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-রচিত সংস্কৃত নাটক 'স্বপ্ন-রঘুবংশম্', শ্রী দিলীপ রায়ের কাব্যনাটিকা 'একটি নায়ক', শ্রী রাম বসুর কাব্যনাট্য 'নীলকণ্ঠে'র অভিনয়, রবিবার সকালে অন্যান্য অনুষ্ঠানসূচীর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক কবিতা-পাঠ ও আধুনিক বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতির আলোচনা। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রথমদিনের পৌরহিত্য করেছিলেন। ওপরের সমস্ত তালিকাই উল্লেখ-যোগ্যের উল্লেখ মাত্র, ছড়ানো-ছড়ানো ভাবে আরো অনেক কিছু মনে আসছে। বিশেষত, বিদেশ থেকে যে-সব কবি ও বিদগ্ধজন কবিতা-মেলাকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, মাইকের সামনে তাদের পুনরাবৃত্তি

শ্রোতাদের কাছে তৃপ্তিকর হয়েছিলো, মনে পড়ছে। সমস্ত অনুষ্ঠানই তিন দিনে ছড়িয়ে ছিল—প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয়, তৃতীয়, বিশেষত দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান আরো প্রাণবন্ত হয়েছিলো ব'লে মনে হয়। হয়তো কবিসংবর্ধনার উজ্জ্বল সূচীই তার অন্যতম প্রধান কারণ। কোনো কোনো বর্ষীয়ান ও তরুণ কবির অনুপস্থিতি শ্রোতাদের কাছে বেদনাদায়ক হয়েছিলো।

সমস্ত য়োরোপের মধ্যে, একমাত্র পারীতেই এ-ধরনের কবিতা-মেলার রেওয়াজ আছে। অবশ্য আমরা যতোটা ভেবে থাকি, ততোটা উল্লেখযোগ্য-ভাবে নয়। বিদেশে, টিকিট কেটে, মৃত বা জীবিত কবিদের কবিতা শুনতে যান কেউ-কেউ। সব টিকিট কদাচিৎ বিক্রি হয় ব'লে শুনেছি। সুতরাং, কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই কবিতা-মেলা—নানাভাবে অভিনন্দন ও আলোচনার যোগ্য। কবিতা-মেলা প্রকারান্তরে কবিতা সম্পর্কে আমাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহেরই পরিচয় দেয়, এবং উপস্থিত-অনুপস্থিত সমস্ত পাঠকের কাছে তার দাবি জানায়। নানা মুনির নানা মত সত্ত্বেও, কবিতা সম্পর্কে পাঠকশ্রেণীর শুচিবাই যে এখন অনেকটা ক'মে এসেছে এ-কথা প্রায় জোরগলায় বলা যায়, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বলা চলে, কবিতার যথার্থ রসাস্বাদ যদিও নির্জনতর পরিবেশেই সম্ভব,কবিতার জনপ্রিয়তার একমাত্র সহনীয় প্রচেষ্টা হিসেবে ও কবিতাপাঠের সার্থক আবহাওয়া-নির্মাতা হিসেবে কবিতা-মেলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এই 'কবিতা-মেলা'র আহ্বায়ক ছিলেন শ্রী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রী মুরারি সাহা। এঁরা, যাঁরা কবিতা-মেলার শুভানুধ্যায়ী ও সংঘটক মণ্ডলী, এবং যে-কবিরা এই কবিতা-মেলায় কবিতা পড়েছিলেন—তাঁরা সবাই শিক্ষিত বাংলাদেশের ধন্যবাদার্হ।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

চারটি কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

গ্যেটের অষ্টম প্রণয়

বর্তমানে কাব্যে আমি রাজা,
গদ্য লেখায় আমার নেই জুড়ি।
কুঞ্জবনে মরণ রটে তাজা,
কিন্তু আরেক রক্তরঙা কুঁড়ি

দুলিয়ে দেয় স্বনিত স্বপ্নেরা
হিমের ক্ষীণ বুন্তে টলোমলো।—
দেশান্তরে, লবণ-জলে ঘেরা,
গোলাপ, তুমি কোন বাগানে জ্বলো?

কোন দ্রাঘিমায় উদ্ভাসিত নীলে
বাঘের মতো নিদাঘে ডাক দিলে,
তুলতে কি চায় তারই প্রতিধ্বনি

পাতার লালে মাতাল নিঃস্বেরা!
আকাশ ভেঙে আগুন ফোটে উষার,
ছদ্মবেশে ব্যর্থ করে তুষার।

—হাতেম, হায় কবির শিরোমণি,
গদ্য লেখায় সবার চেয়ে সেরা!

গ্যেটের নবম প্রণয়

সকলি ভুল! আসলে নই আমি!
—অস্তমেঘে পদ্মরাগ ফোটে,
ভোরের গাঙে সোনার ঢেউ ওঠে।
এই প্রেমেও অন্য কেউ স্বামী।

ফুরোয় না যে-আগুন, সে কি আমার?
যে চায় সব, হয় যে তাকে দিতে
মন্ত্রীগিরি, ভ্রমণ ইটালিতে,
গবেষণার সাত-মহলা মিনার।

তেমনি তুমি।—যদিও রাত হ'লো,
জলসাঘরে বিরামহীন বাঁশি,
কেমন ক'রে ঘুমোই আমি, বলো!

তোমায় ছেনে হাওয়ায় আমি রটি,
বাজাই এক নতুন অমরতা;
আমি সে-নাচ, তুমি কেবল নটী।

গোলাপ, তুমি বুঝবে না এই কথা।
এবং তাই তোমায় ভালোবাসি।

সর্বেশ্বরী

অবশেষে তোমাকে জোগায় খাদ্য যা-কিছু আমার
বিকার, বিক্ষেপ, ব্যাধি, নষ্ট দিন, কষ্টের জীবিকা;

অজ্ঞান পেশীর পুঞ্জ নেয় টেনে আবৃত শিবিকা,
অন্তরালে নিদ্রাময়ী, অন্য কোনো চিহ্ন নেই যার

ন'ড়ে-ওঠা নিক্কণের এক বিন্দু নিঃসরণ ছাড়া।
—সব, সব তোমাকেই! আর নেই দ্বন্দ্বের বিচ্ছেদ,
মন্দ ভালো, স্বাস্থ্য রোগ, নিঃশ্রেয়স এবং নির্বেদ
ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায় দেয় অন্ধকারে পরস্পরে সাড়া;

ঘটায়, ঘোমটার তলে, মৌলিকের নিত্য রূপান্তর—
পদার্থের, চেতনায়; স্পন্দমান মাংসের, মানসে;
বিষ্ঠার, প্রোজ্জ্বল ফুলে; অঙ্গারের, নবান্ন-পায়সে;
এবং মলের ভাণ্ডে ছেঁকে তোলে সম্ভাব্য ঈশ্বর।

—তবে কেন ভয়? কেন আজও ত্রাস, আক্রমণ, ঘৃণা,
পাছে চোর নিঃস্ব করে, আয়ু ঝরে যেন মূঢ় মাছি?
বৎসর হিংসুক! কিন্তু আমি তারই চক্রান্তে জেনেছি
যা তোমার সেবা নয়, কিছুতেই আমি তা পারি না।

মুক্তির মুহূর্ত

মাথায় গাধার টুপি, আঁটো গেঞ্জি, ধূসর লুঙ্গিতে
সকালের গোলপার্কে শুরু ক'রে দৈনিক রুটিন,
ফুটপাতে রেখে চোখ, নুয়ে-পড়া মেয়েলি ভঙ্গিতে
চিন্তাশীল মনোযোগে পথে-পথে ঘাঁটে ডাস্টবিন

যতক্ষণ কালিঘাটে স্কুল থেকে না ফেরে ছেলেরা।
—জঞ্জাল, কাচের টুকরো, পচা ফুল, মাছির আহ্লাদ,

কাগজের দামি ঠোঙা, আরো দামি হলুদ সংবাদ,
তা থেকে নিশ্বাস ছেঁকে, জয় ক'রে নৈরাশ্য, কলেরা,

আসে যদি, উজ্জ্বল আধুলি ট্যাঁকে, তোমার বস্তির
ভাঙা গাল, ঝোলা মাংসে গ্যাস-জ্বলা নেশায় অস্থির :—
বোন, তাকে দিয়ো সব, সারসত্য যা-কিছু তোমার,

উদার, উন্মুক্ত বাহু, অনায়াস উরুর বিস্তার,
আর ব্যাপ্ত বিতর্করহিত এক আঁধার গহ্বর—
যার মধ্যে ডুবে গিয়ে, শিখে নেবে সে তোমার কাছে,

এ-জীবনে ক্ষুধা আর শ্রম ছাড়া আরো কিছু আছে,
আছে মৃত্যু, মুক্তির মুহূর্ত, আর আছেন ঈশ্বর।

চিঠিপত্র

জীবনানন্দ দাশের কবিতা

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপে,

'কবিতা'র আশ্বিন, ১৩৬৩ সংখ্যায় শ্রী নিরুপম চট্টোপাধ্যায়ের "দুজন অসবর্ণ কবি" পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া গেলো। আনন্দ অবিমিশ্র নয় একথা জানিয়েও বলতে ইচ্ছা করে যে এমন বুদ্ধিমান রচনা আমাদের দেশে বিরল। নিরুপমবাবু একাধিক কারণে ধন্যবাদার্হ। জীবনানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার মৌল পার্থক্যটি একটিমাত্র উজ্জ্বল উদাহরণেই তিনি পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নকে সন্দেহ ক'রে হয়তো বহুজন বহু কথা জানাবেন, কিন্তু আমি অন্য একটি বিষয়ে আপত্তি জানাতে চাই।

কবিতাটির বক্তব্য সম্পর্কে শ্রী নিরুপম চট্টোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে এসেছেন : "প্রগাঢ় পিতামহী প্যাঁচার সমাচারই শেষ পর্যন্ত বিচক্ষণ, কেননা কী হয় মানুষের আত্মহত্যায়, জীবনে তার কোনো স্বাক্ষর নেই।" কিন্তু দেখা যাক, মানুষটির মৃত্যুর সমস্ত রকম সম্ভাব্য বাস্তব কারণ খুঁজে কবি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার যে-প্রায়দার্শনিক যুক্তি দেখালেন, তারপরে, কবিতার শেষ দুই স্তবকে প্যাঁচাকে দিয়ে কী বলিয়েছেন :

> তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
> থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে ব'সে এসে
> চোখ পাল্টায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে ?
> চমৎকার !
> ধরা যাক্ দু'একটা ইঁদুর এবার—'

এ বাচনের অর্থ কী ? 'বুড়িচাঁদ বেনোজলে ভেসে' যাওয়ার পরিণামে অন্ধকার এনে দেবে 'চমৎকার' সুযোগ, যখন 'দু'একটা ইঁদুর ধরা' অর্থাৎ জীবনকে উপভোগের উপাদান সব প্যাঁচার পক্ষে সহজলভ্য হয়ে উঠবে ! নিরঙ্কুশ ধৈর্যের

আসনে ব'সে থেকে সুযোগের প্রতীক্ষা ক'রে যেতে হবে জীবনের মহাভোজের স্বাদ নেবার। অবশ্যই এ-সিদ্ধান্ত জীবিত পৃথিবীর বিচক্ষণ মানুষদের জীবনাদর্শে পরিপূর্ণ। কিন্তু কবিতার চূড়ান্ত বক্তব্য কি এতটুকুই ?

পূর্বস্তবকে কবি জানিয়েছেন যে নারীর হৃদয়, প্রেম, শিশু, গৃহ, অর্থ, সচ্ছলতা সব নয়—দৈনন্দিন পৃথিবীর এ-সব কাম্য বস্তুর উপস্থিতি কি অভাবের সাহায্যে এ-মৃত্যু ব্যাখ্যাত হবার নয়। রক্তের ভিতরের এক বিপন্ন বিস্ময়ের অনিবার্য পরিণতি যে-ক্লান্তিবোধে তাই এ-মানুষটিকে মৃত্যুতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। এবং তারপরে প্যাঁচাকে আবার অশথের ডালে বসিয়ে সাধারণ পৃথিবীর জীবনের ফরমুলাই বলবো আউড়িয়েছেন তাকে দিয়ে।

কিন্তু এই প্রগাঢ় পিতামহীটির সিদ্ধান্ত যে কবির চোখেও বিচক্ষণ এমন ইঙ্গিত কবিতার শেষাংশে কোথাও নেই। কবি কদাপি এই বক্তব্যকে স্বাগত করেননি। বরং সেই শেষ স্তবকে জীবনানন্দ বলেছেন :

> হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার ?
> আমিও তোমার মত বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি ক'রে দেবো
> কালীদহে বেনোজলে পার ;
> আমরা দুজনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

এ পংক্তিগুলির অর্থ কী ? জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার শূন্য ক'রে চ'লে যাওয়া এই অগণিত মানুষের পৃথিবীর জীবনাদর্শ। তুমি তার কথাই বলছো। আমিও সেই "যে পথে অসংখ্য লোক চলিয়াছে" অগ্রসর হবো। কিন্তু, তবু "হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার ?" নিরুপমবাবু এই জিজ্ঞাসাচিহ্নটি দেখতে ভুলেছেন। এই মৃত মহাজ্ঞানী ব্যক্তি জেনেছিল "যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের, তার সাথে মানুষের হয় নাকো দেখা।" তাই সে মৃত্যুতে মুক্তি খুঁজেছে। এই মৃত্যুর এই ব্যাখ্যাটি দেওয়ার পর কবি প্যাঁচাকে অশথের ডালে বসিয়েছেন। তাকে দিয়ে সেই সাধারণ মানুষের জীবনাদর্শের কথা শুনিয়েছেন। নিরুপমবাবু বলেছেন—প্যাঁচাটির সিদ্ধান্ত বিচক্ষণ ব'লেই তাকে কবিতার শেষে আনার দরকার হয়েছে। কিন্তু আসলে মানুষটির মৃত্যুর কারণ

নির্ণীত হওয়ার আলোকে কবি সেই পুরোনো জীবনাদর্শকে প্রশ্ন করেছেন। প্রসঙ্গত, এই প্যাঁচার ভাষণের উল্লেখ আমরা কবিতায় আগে আর একবার পেয়েছি যখন কবি লোকটির মৃত্যুর বর্ণনা এবং কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করছিলেন। তখন প্যাঁচার সমাচার লোকটির সিদ্ধান্তকে টলাতে পারেনি। কবি বলেছেন, এই মানুষটির এই অনিবার্য মৃত্যুর পটভূমিকাতেও কি প্রগাঢ় পিতামহীর সমাচার বিচক্ষণ, চমৎকার? তাই, এখন প্যাঁচার সিদ্ধান্ত আরম্ভ করার আগে কবি একটি "তবু" এনেছেন—"তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি।" যেন, এ-মৃত্যুর পর তবুও কি তোমার সমাচারই বিচক্ষণ? কবি যখন "হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?"—ব'লে প্রশ্ন করছেন, তারপরে আসছে জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার শূন্য ক'রে চ'লে যাওয়ার কথা, যেন কবি বলতে চাইলেন জীবনের ভাঁড়ার শেষ ক'রে আমিও হয়তো চ'লে যাবো; তবু আজ এই মুহূর্তে এই মৃত্যুতে এ-সংশয় স্বাভাবিক, সংগত ও সুষ্ঠু যে যে-জীবনের কথা প্যাঁচার তথা পৃথিবীর মুখে শোনা যাচ্ছে, তা কি সত্যই বরেণ্য? এই জন্যই কবি বলছেন, "আমিও তোমার মত বুড়ো হবো।" বার্ধক্যের চরিত্রানুগ উপভোগের লালসা প্যাঁচার কণ্ঠে। কিন্তু যৌবনের যোগ্য সংশয়ের প্রেরণায় কবি প্যাঁচার বিচক্ষণ সমাচারকে প্রশ্ন করেছেন। এই চূড়ান্ত জিজ্ঞাসাতেই কবির ও কবিতার আসল মানসতা স্পষ্ট। এই মৃত্যুর আলোকে জীবিত পৃথিবীর জীবনের মূল্যবোধকে কবি প্রশ্ন করেছেন। কবিতার শেষ চার স্তবক থেকেই জীবনানন্দের এই সংশয়ের মানসতাটি আভাসিত। এই শেষ চার স্তবকে তাও অনুপস্থিত। "তবু শোনো এ মৃতের গল্প" ব'লে তিনি যে-ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলেন তাতে ব্যঙ্গ তো নেই, বরং সহানুভূতির আভাস আছে। নিরুপমবাবু বলেছেন—"মৃদু করুণার আভাস আছে।" এই চার স্তবকের আগের সেই রূঢ় ব্যঙ্গময় পংক্তিগুলি স্মরণ করলে মনে হয় যে এতক্ষণ ধরে জীবিত মানুষের বিদ্রূপান্বিত চোখে এ-মৃত্যুর কী রূপ, তা তুলে ধরার চেষ্টা করছিলেন কবি। ব্যঙ্গ থেকে সংশয়ে এই পরিবর্তনই কবির প্রকৃত মানসকে প্রকাশ করেছে। জীবিত লোকের চোখে এ-আত্মহত্যা অর্থহীন। কিন্তু এই আত্মহত্যার আলোকে পুরোনো

জীবনাদর্শে কবির সংশয় জাগ্রত হোলো। এবং এমন একটি সংশয়ই জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যবিচারে স্বাভাবিক। আরও স্বাভাবিক, যখন মনে রাখি এটি 'মহাপৃথিবী'র এক কবিতা।

"ধূসর পাণ্ডুলিপি" যে ঐশ্বর্যময় নিসর্গপৃথিবীর গান তা নিরঙ্কুশ আনন্দের নয়। প্রকৃতির যে-পাঠ নিয়ে কবির পাণ্ডুলিপি রচিত হোলো তা যেন ধূসর। তবু এখানে প্রকৃতির যে-রূপ তা প্রধানত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পরবর্তী গ্রন্থ "বনলতা সেন"-এ কবির প্রকৃতি-দৃষ্টি ভিন্ন, গভীর এবং গূঢ়, প্রায় দার্শনিক। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভবের বর্জনে নয়, সার্থক অঙ্গীকারে, "বনলতা" এই নামটিই যথেষ্ট ইঙ্গিতময়, "বনলতা" তথা প্রকৃতি। প্রকৃতিকে তিনি দেখলেন নারীরূপে। এক প্রকৃতি (নিসর্গপৃথিবী) ভাবসাদৃশ্য পেলো আর এক প্রকৃতিতে (নারী)। সংস্কৃত সাহিত্য আর আমাদের বাংলা সাহিত্যেও বনদেবীর কল্পনা যেমন প্রাচীন তেমনি প্রচলিত, তেমনি গূঢ়ার্থময়। 'বনলতা সেন' কবিতাটির প্রথম স্তবকে কবি বলছেন তাঁর অন্বেষাজর্জর ক্লান্ত প্রাণকে বনলতা সেন দুদণ্ডের শান্তি দিয়েছিলো, আর শেষ স্তবকে সমস্ত কিছু আলো আয়োজনের শেষে কবি বনলতাকে দেখলেন অন্তহীন প্রশান্তির মধ্যে। ভাবের দিক থেকে এবং রচনার কালের দিক থেকে নিকটবর্তী কবিতাগুচ্ছে আমরা এ-সময়ে কবির প্রকৃতি সম্বন্ধে এক ধরনের দ্বৈত মনোভাব লক্ষ্য করি। প্রথম থেকেই তিনি প্রকৃতির বেদনার, আঘাতের এবং হিংস্রতার দিকটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু একালের কবিতাগুলিতে দেখি তিনি সেই বোধ সম্বন্ধে এক প্রকার সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছেন। আমাদের জীবন যদি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিলীন হয় তাহলেই হয়তো নিষ্ঠুর যে অপ্রতিরোধ্য তাকে এড়ানো গেলো। তাই তিনি বলেন, "আমি যদি বনহংস হতাম"। প্রকৃতির জীবন অঙ্গীকার করে নিতে হবে।

পরবর্তী কালে, "মহাপৃথিবী" আর "সাতটি তারার তিমির"-এ তিনি প্রধানত মানবসমাজ সম্পর্কে, যত ভিন্ন এবং হতাশভাবেই হোক না কেন, অবহিত। তবু "মহাপৃথিবী" বলতে বুঝতে হবে নিসর্গপৃথিবী আর মানবপৃথিবীর সমাহার। "মহাপৃথিবী"র কিছু কবিতা যেমন দৈনন্দিন জীবনঘনিষ্ঠ, তেমনি কিছু কবিতা

স্পষ্টত প্রকৃতিকেন্দ্রিক—যেমন, "ঘাস", "সিন্ধুসারস", "হাজার বছর শুধু খেলা করে", ইত্যাদি। এর পর তিনি লিখলেন "সাতটি তারার তিমির"। এ-নামটি আশ্চর্য ইঙ্গিতময়। সপ্তর্ষিমণ্ডল, যাকে আমরা ধ্রুব, অনড় ব'লে জানি, আমাদের এতদিনের বিশ্বাসের যা আশ্রয়, আজকের ক্রান্তিকালে আর সে পথ দেখাচ্ছে না। তাই 'আলো আর আলো নয়, অন্ধকার'। এর পরে আর কোনো গ্রন্থ বেরোয়নি। কিন্তু উত্তরকালে রচিত কবিতায় প্রকৃতি সম্বন্ধে দৃষ্টি-ভঙ্গিতে আরও এক পরিবর্তন লক্ষ্য করি। মানবিক হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষার বর্জন নয়, অঙ্গীকারেই প্রকৃতি হবে নূতন অর্থে প্রোজ্জ্বল। তাই তিনি লেখেন "আলো-পৃথিবী" কবিতাটিতে—

শতকের ম্লান চিহ্ন ছেয়ে দিড়ে যদি
নরনারী নেমে পড়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে
সব গ্লানি না কাটলেও
তবু আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্যের শপথে।

এই কবিতাটিতে আমরা জীবনানন্দের প্রকৃতিধারণায় নূতন অধ্যায়ের সূচনা দেখি। প্রকৃতি ও হৃদয়ের সমাহারে, প্রকৃতিপৃথিবীর প্রশান্তির সঙ্গে মানবপৃথিবীর হৃদয়মূল্যের যোগ হলেই পৃথিবী হবে আলোময়—'আলোপৃথিবী'।

নিরুপমবাবু জীবনানন্দের প্রকৃতিদৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে যে-সব কথা বলেছেন তা বহুকাল আগেই আপনি "কালের পুতুলে" জানিয়েছিলেন। জীবনানন্দের প্রকৃতি হেমন্তময় ব'লে দায়মুক্ত হওয়া যায় না। তাঁর প্রকৃতি-দৃষ্টিতে পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করা প্রয়োজন, কীটসীয় ইন্দ্রিয়ময়তা থেকে প্রকৃতি-দৃষ্টিতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় দার্শনিকতা,—নশ্বর, পরিবর্তনময় প্রকৃতিতে প্রশান্তির সন্ধান পাওয়া, প্রকৃতিলীন জীবনযাপনের ধারণা থেকে প্রকৃতি ও হৃদয়ের সমাহারে হরিৎ আলোপৃথিবীর চেতনায় উত্তরণ লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

শালিখা, হাওড়া

প্রদ্যুম্ন মিত্র

সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর: বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক: নরেশগুহ। কবিতাভবন ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্র-নাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ১৩ মেট্রপলিটান প্রিণ্টিং অ্যাণ্ড পাবলিসিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

'কবিতা'র এই আষাঢ় সংখ্যার সঙ্গে আপনার একবিংশ বর্ষের চাঁদা শেষ হ'লো। দ্বাবিংশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৬৪) আগামী নবেম্বরের মধ্যভাগে প্রকাশিত হবে। নূতন বছরের চাঁদা (সাধারণ ডাকে ৪৲, রেজিষ্টার্ড ডাকে ৬৲) আগামী ৭ই নবেম্বরের মধ্যে মনি-অর্ডারে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানাই। যাঁরা আগামী বছরে গ্রাহক থাকতে ইচ্ছুক নন, তাঁদের নিষেধাজ্ঞাও ঐ তারিখের মধ্যে পৌঁছনো দরকার। যাঁরা চাঁদা বা নিষেধাজ্ঞা না পাঠাবেন, তাঁদের সকলকেই আমরা আশ্বিন সংখ্যা বার্ষিক মূল্যের ভি. পি.তে পাঠিয়ে দেবো। ভি. পি.তে খরচ পড়বে সাধারণ গ্রাহকদের পক্ষে ৫৲, রেজিষ্টার্ড গ্রাহকদের পক্ষে ৭৲; অতএব মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠানোই সুবিধাজনক।

আগামী বছরে যাঁরা নূতন গ্রাহক হ'তে চান, তাঁদেরও উপরোক্ত তারিখের মধ্যে চাঁদা পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ জানাই। মনি-অর্ডার পাঠাবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ে অনুগ্রহ ক'রে দৃষ্টি রাখলে আমরা বাধিত হবো :

(১) নূতন গ্রাহকরা কুপনে "নূতন গ্রাহক" কথাটি লিখে দেবেন।

(২) পুরোনো গ্রাহকরা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করবেন।

(৩) নূতন ও পুরোনো গ্রাহক সকলেই কুপনের উল্টো পিঠে নাম ও ঠিকানা লিখে দেবেন।

এই নিয়মগুলি জরুরি। এর ব্যতিক্রম ঘটলে পত্রিকা পাঠাতে বিলম্ব অথবা গোলযোগ হ'তে পারে।

চিঠিপত্র ও মনি-অর্ডার পাঠাবার ঠিকানা :

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ
কারণ
গুণে অতুলনীয়

বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যপ্রদ,
সুস্বাদু ও পুষ্টিকর

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪